জ্ঞানের আসর



জ্ঞানের আসর

ডঃ কমল চক্রবর্তী

অভয় পাবলিকেশনস্
৩৬, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
এ. ঘোষ
৩৬, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৫ই আগস্ট ১৯৮৩

মূল্য : ছয় টাকা মাত্র

প্রচ্ছদ :
সত্য চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
স্বপনকুমার ঘোষ
লেখা প্রেস
৬, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭

নিবেদন

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে কয়েকটা লেখা তৈরী করেছিলাম। এর কয়েকটি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিতও হয়েছে। বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য রেখে বইয়ের নাম দিলাম 'জ্ঞানের আসর'। আশাকরি বইটি পাঠককে আনন্দ দেবে। গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য শ্রীঅভয় কুমার ঘোষ মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাই।

সুরেন্দ্রনাথ সান্ধ্য কলেজ।
১৫ই আগষ্ট, ১৯৮৩

নিবেদক—
কমল চক্রবর্তী

উৎসর্গ

বাংলা ভাষায় যাঁরা বিজ্ঞান লিখে গর্ববোধ করেন তাঁদের উদ্দেশ্যে।

সূচীপত্র

লেখকের অন্যান্য বই —

বিজ্ঞানের ছড়া
বিজ্ঞান বিচিত্রা
বিজ্ঞান ভাবনা
অংক কষা সহজ

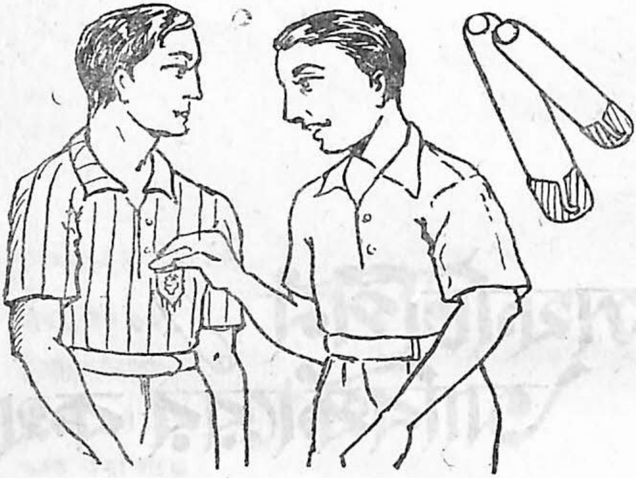
সেফটিপিন আবিষ্কারের কথা



সাধারণ পিন যা আমরা ব্যবহার করি কতকগুলি কাগজকে একসঙ্গে আটকে রাখার জন্য, তা আবার কখনও কখনও বিপদ ঘটায়। জামার বোতাম ছিঁড়ে গেলে যদি সাধারণ পিন ব্যবহার করা হয়, তবে তা বুকে অনেক সময় খোঁচা মারে। তাই এর ব্যবহার এক্ষেত্রে মোটেই সুবিধের নয়। সাধারণ পিন বা আলপিনের কিছুটা উন্নতি ঘটাতে পারলে, এই খোঁচা খাওয়ার হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে।

আলপিনের হাত থেকে বাঁচার জন্য যে পিন সৃষ্টি হল, তারই নাম সেফটিপিন। নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এটি নিরাপদ পিন। পিন শরীরে ফুটলে ব্যথা লাগে, তাই একজন বুদ্ধিমান লোক লম্বা এক আলপিনকে বেঁকিয়ে পিনের দুই প্রান্তকে একই দিকে করলেন। যেন দুটি সমান্তরাল সরলরেখা কিছু দূর গিয়ে বেঁকে পরস্পর একদিকে মিশে গেছে। খোলা দুই প্রান্তের ওপর ভোঁতা টুপি পরিয়ে তিনি পিনের আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টা

সফল হতে পারে নি। কারণ মাথার টুপিটা খুলে গেলে পিন আর নিরাপদ থাকত না, তাই দীর্ঘদিন এই সমস্যা রয়ে গেল।



অবশেষে এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ওয়াল্টার হাণ্ট নামে এক মার্কিন কারিগর একটা উপায় আবিষ্কার করে ফেললেন। আজকের দিনে যে সেফটিপিন দেখতে পাই, ঠিক সেরকম পিন তৈরী করে ফেললেন তিনি। লম্বা বাঁকানো পিনের খোলা ছুটি মুখের একটিতে তিনি টুপি এমনভাবে আটকে দিলেন যে সেটা খুলে যায় না। এই টুপির মধ্যে দ্বিতীয় প্রান্তটা ঠেলে ঢুকিয়ে দিলে, সেটাও সেখানে আটকা পড়ে। খোলা প্রান্তের নিচের দিকে অর্থাৎ সেফটিপিনের নিচের দিকটাতে একটা বৃত্তের মতো গোল করে ছুই প্রান্তকে ওপরে রাখলে, পিনটি স্প্রিংয়ের কাজ করতে পারে। এই স্প্রিং তৈরী হবার ফলে পিনের এক প্রান্তের স্থির টুপিটার মধ্যে অন্য প্রান্তের সরু দিকটা ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এইভাবে ওয়াল্টার হাণ্ট বুদ্ধি খাটিয়ে বহুদিনের এক সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তাঁর আবিষ্কৃত এই সেফটিপিন আজও আমাদের কাছে মূল্যবান হয়ে রয়েছে।

পরীক্ষাগারের নাক

শরীরের কোন্ অংশে নাক থাকে, তা আমরা জানি। নাকটাকে বাদ দিয়ে কোন মানুষকে আমরা চিন্তা করতে পারি না। তিমি মাছের মাথার ওপর তার নাক থাকে, যদিও সেখানে চোখ থাকার কথা। হাতির শুঁড় আমরা দেখেছি কিন্তু সেটা শুধু শুঁড়ই নয়, আসলে তা নাক। হাতির পর যার বড় নাক আছে তা হল টেপির। মোটামুটিভাবে নাকের গড়নটা আমরা জানি। দো-নলা সুড়ঙ্গের মতো। সুকুমার রায় 'নাকের বাহার' নিয়ে অনেক কথাই আলোচনা করেছেন, আর তাই পড়ে আমরা নাকের বিচিত্র কথা জানতে পারি। বাঁদরের খাঁদা নাক থাকে, তাই তার নাকের দুর্নাম আছে। আর কোন মানুষের যদি তেমন খাঁদা নাক থাকে, তবে তার কপালেও দুর্ভোগ ঘটতে পারে। দুষ্টু ছেলেরা খাঁদা নাকওয়ালা লোককে খেপাতে পারে। তাই খাঁদা নাকের কোন লোক যদি আসল নাকের বদলে কৃত্রিম নাক বসিয়ে নেয়, তবে হয়ত সে দুষ্টুদের হাত থেকে রেহাই পাবে। শুধু তাই নয়, নাকের শ্রী ফিরে পেলে, সে হয়ত মুখের শ্রীও ফিরে পাবে।

নাকের প্রধান কাজ নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া। এছাড়া গন্ধ নেওয়ার ব্যাপারেও তার মূল্য অপরিসীম। নাক হচ্ছে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, এটির কাজ হচ্ছে বিভিন্ন গন্ধকে আলাদা করে চিনিয়ে দেওয়া। এটি একরকম ঝিল্লী-আবরিত সুবেদী কোষ। পরীক্ষাগারে ডিজাইন করা 'নাক' এই ধরনের নিয়ম মেনে কাজ করতে পারে। একাজ করা হয়েছে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের পরীক্ষাগারে। যে তরল বা গ্যাস বিশ্লেষণ করা হবে তা এই ঝিল্লী পর্দার ভেতর দিয়ে যায়। কৃত্রিম গ্রাহক যন্ত্রটির ওপরে যে বৈদ্যুতিক চার্জ থাকে, তা বদলে যায় যদি গন্ধযুক্ত কোন যৌগ অণু তার সামনে আসে। এই বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক যন্ত্র খবর নিয়ন্ত্রণ করে একজনের কাছে 'ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অনুভূতির সংবাদ দেয় এবং তা মস্তিষ্কের কাজের মতোই।

এই যন্ত্রের দ্বারা বায়ু দূষণের বিন্যাস বোঝা যায়। এছাড়া অপরাধীদের ধরতে ও চিকিৎসা জগতে এটি ব্যবহার করা হয়। এইভাবে নাকের কাজ করা হয় বলে, একে কৃত্রিম নাক বলা হয়। পরীক্ষাগারের এই নাকের কদর দিন দিন বেড়ে যাবে, এ আশা আমরা রাখতে পারি।



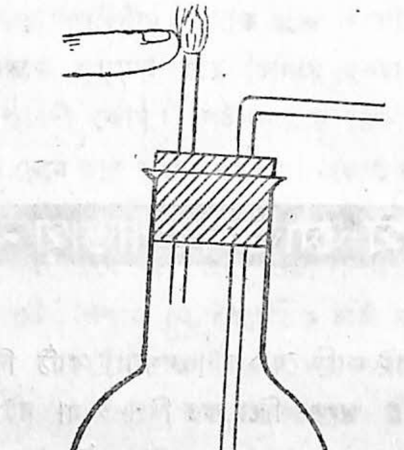
যে আগুন পোড়ায় না

আমরা সকলেই জানি যে একটা দেশলাই কাঠি দিয়ে যে আগুন জ্বালানো যায়, সেই আগুন দিয়ে কত বিপদই না ঘটা সম্ভব। এই আগুনে কাঠ পোড়ানো, মড়া পোড়ানো সবই সম্ভব। কিন্তু আজ এমন এক আগুনের কথা বলব যে আগুন সামান্য একটা আঙ্গুলও পোড়াতে পারবে না। এ আবার কেমন আগুন? এর নাম ঠাণ্ডা আগুনের শিখা। এ ধরনের আগুনের শিখা কেমন করে পাওয়া যায় তা এবার জানা যাক।

আমরা ফসফরাসের নাম শুনেছি, এই ফসফরাস আবার দু'ধরনের —লাল আর সাদা। এই ফসফরাস হল মানুষের শরীরের মধ্যে যে হাড় আছে তারই একটা উপাদান।

একটা বিশেষ ধরনের পাত্রে কিছু শুকনো সাদা ফসফরাসের টুকরো রাখা হয়। এই পাত্রের মধ্যে একটা প্রবেশপথ রাখা হয় যার ভেতর দিয়ে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস পাঠানো হয়। একটা অন্ধকার ঘরে এই পাত্রটা (যাকে ফ্লাস্ক বলে) একটা গরম জলের পাত্রে রেখে ওই নির্দিষ্ট পথ দিয়ে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস পাঠানো হয়। এই বিশেষ ধরনের পাত্রে আর একটা ছোট নল লাগানো থাকে। এখন এই নল দিয়ে দেখা যাবে ফিকে সবুজ ধরনের আলোর শিখা জ্বলে উঠছে। কিন্তু আশ্চর্যের জিনিস এই যে, এই আগুনে আমাদের

আঙ্গুল রাখলে গরম মনে হবে না, এমনকি একটা দেশলাই কাঠিও জ্বলে উঠবে না।



এখন সবচেয়ে অসুবিধা হল, যে সাদা ফসফরাস ব্যবহার করা হয় সেটা খুব বিষাক্ত। তাই যারা দেশলাইয়ের কারখানায় কাজ করে, তাদের এক ধরনের অসুখে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, যাকে বলে ফসজী-জ। এই বিশেষ ধরনের ঠাণ্ডা আলো আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী স্মিদেল। তাঁর নাম অনুযায়ী এই আলোর নাম তাই স্মিদেলের ঠাণ্ডা শিখা।



রসুন

আমরা যখন বাঁচতে চাই, তখন খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদের রাখতেই হবে। রান্নাঘরে তাই ভোর থেকেই ব্যস্ততা দেখা যায়। খাদ্যকে সুস্বাদু করে তুলতে গেলে, প্রয়োজন হয় তেল, মশলা প্রভৃতি। পেঁয়াজ আর রসুনও রান্নায় ব্যবহার করা হয়। এদেরকে মশলার মধ্যেই স্থান দেওয়া হয়। এদের বিশিষ্ট গন্ধ আছে। চোখ বুজে গন্ধ শুঁকেই আমরা এদের খুঁজে নিতে পারি। রসুন আমরা মশলা হিসেবেই নয়, ওষুধ হিসেবেও ব্যবহার করি। রসুনের গন্ধের মূলে আছে অ্যালিসিন। রসুনের কোয়া যত ছাড়ানো যায় তত এর গন্ধ বের হয়ে আসে। অ্যালিসিন আড়ষ্ট অবস্থায় ততটা গন্ধ ছড়ায় না। অ্যালিনকে একটি উৎসেচক (এনজাইম) দিয়ে অ্যালিসিনে পরিণত করা যায় এবং শিথিল অবস্থায় এর থেকে গন্ধ সহজে বেরিয়ে আসে। রসুনের মধ্যে অ্যালিসিন ছাড়া পাওয়া যায় অ্যালিসেটিন—১, অ্যালিসেটিন—২, গারলিক ফাইটনসাইডস, গারলিসিন নামের কয়েকটি পদার্থ। অ্যালিসিনের রাসায়নিক নাম হচ্ছে ডাই-অ্যালাইল ডাইসালফাইড। নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, এর মধ্যে দুটি গন্ধক পরমাণু আছে।

রসুনকে বোটানির ভাষায় বলা হয় অ্যালিয়াম স্যাটিভাম। সুশ্রুত সংহিতায় রসুনের রোগসারানো গুণের কথা বলা হয়েছে। অর্শ, বাত, ত্বকের ব্যথা, তলপেটের ব্যথা, অরুচি, কাশি, কুষ্ঠ, প্রভৃতি রোগে রসুনের উপকারিতা সেখানে স্বীকার করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ক্ষত, দাঁতের ব্যথা, মৃগীরোগ, বুকের ব্যথায় রসুনের ব্যবহারের কথা হিপোক্রাটস নিজেই স্বীকার করেন। প্রাচীনকালে ইজিপ্টের শ্রমিকদের এটি খেতে দেওয়া হতো, কারণ এটি শরীরের শক্তি বাড়াতে পারে বলে মনে করা হতো। প্রাচীন মেটিরিয়া মেডিকাতে রসুনের ব্যাপক ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা আছে ; যেমন—অর্শ, বাত, দাঁতের

ব্যথা প্রভৃতি যে সব রোগ আগে বলা হয়েছে, সেগুলি ছাড়া চামড়ার রোগ, কুকুর বা সাপের কামড়ে এর উপকারিতা বিশেষভাবে বলা আছে। জন্মকালীন শরীরে কোন দাগ থাকলে তাও এর সাহায্যে দূর করা যেতে পারে। এছাড়া ব্লাডসুগার, কোলেস্টারল প্রভৃতি কমানোর জন্যও এর ব্যবহার স্বীকৃত হয়েছে। রক্তচাপ, হৃদরোগ এবং হাঁপানি রোগের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের কথা কয়েক বছর আগে জানা গেছে। বর্তমানে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, রসুন সব সময় ব্লাডসুগার, কোলেস্টারল প্রভৃতি কমায় না, বরং মাঝে মাঝে তা বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়া সেসব ক্ষেত্রে রসুন ব্যবহার করা উচিত নয়।

কাঁচা রসুনের মধ্যে প্রতি ব্যাকটিরিয়াজাত ধর্ম দেখা যায়। রসুনের রসকে জলীয় মাধ্যমে সংগ্রহ করলে, তা ব্যাকটিরিয়ার সৃষ্টি ব্যাহত করতে পারে। ছত্রাকের জন্য যে সব রোগ পোলট্রির খাদ্যে আসতে পারে তারও প্রতিরোধ রসুনের সাহায্যে হয়। দাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার আছে। রসুন নির্যাসের মধ্যে প্রতিব্যাকটিরিয়াজাত যে সক্রিয়তা দেখা যায়, রান্না করা খাদ্যে অবশ্য এই গুণটি নষ্ট হয়ে যায়। রসুনের নির্যাস নিয়ে তার সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণ জল মিশিয়ে ব্যবহার করলে চামড়ার ক্ষত সেরে যায়। বর্তমানে শুধু মানুষের চিকিৎসায় নয়, পশুর চিকিৎসায়ও এর ব্যবহারের চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন ওষুধ তৈরীতেও এটি কাজে লাগানো হচ্ছে।

এটি একটি একবীজপত্রী উদ্ভিদ। এর চাষের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়ে রসুনের কোয়া মাটিতে ছড়িয়ে দিতে হয় এবং ঠিকভাবে তা দেখাশুনা করলে, ছয় থেকে সাত মাসের মধ্যে রসুন মাটি থেকে পাওয়া যায়। দেখা গেছে, এদেশের মাটিতে প্রতি একর জমিতে গড়ে চল্লিশ কুইন্টাল ফলন সম্ভব। সুতরাং এর যখন ব্যাপক ব্যবহার আছে, তখন এর চাষের দিকে নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

ধাতুর ক্ষয় ও পরিত্রাণের পথ

শহরে যে সব বড় বড় বাড়ি থাকে, তার একটা বেছে নিয়ে যদি ভাঙ্গতে শুরু করা যায়, তবে কয়েকদিনেই মিস্ত্রিরা তা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে। আর এই ভাঙ্গনের সময় শোনা যাবে ইট-ভাঙ্গার শব্দ। কিন্তু নিঃশব্দে একটা লোহার পাইপকে ধীরে ধীরে ভেঙ্গে দিতে পারে এক অদৃশ্যশক্তি। এই ভাঙ্গার কাজে কোন অলৌকিক বা ভূতুড়ে ব্যাপার থাকে না। এই শক্তি জুটে যায় বায়ুমণ্ডল থেকে। বায়ুর অক্সিজেন ও জলীয়বাষ্প লোহার উপর তাদের শক্তি প্রয়োগ করে লোহাকে ক্ষয়ের পথে নিয়ে যায়। আর এই ক্ষয়ের ফলে শক্ত লোহা ধ্বংস হয়, আর তা হয় নিঃশব্দে।

একটি বাড়ির নিরাপত্তা, সৌন্দর্য প্রভৃতি নির্ভর করে বিভিন্ন ধাতু ও তাদের কিছু কিছু যৌগের উপর। একটি বাড়ির জানলা, বারান্দার গ্রিল, কোলাপসিবল গেট এসব দরকার নিরাপত্তার জন্য। এসবের ব্যবহার সৌন্দর্যকেও ডেকে আনে। এছাড়া বাসনপত্র, কলের নল, তালা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিস মূলতঃ তৈরী হয় লোহার সাহায্যে। তবে সে লোহা একেবারে বিশুদ্ধ নয়। লোহা ছাড়া তামা, দস্তা, টিন

প্রভৃতিও ব্যবহার করা হয়। তবে এসব পদার্থ দিয়ে তৈরী আসবাব-পত্রেরও রেহাই নেই। এইসব ধাতুর ক্ষয়কে বিজ্ঞানের ভাষায় ধাতু-অবক্ষতি বলা হয়। সাধারণভাবে বলা হয় মরিচা। এই মরিচা বর্তমান সভ্যতার এক শত্রুবিশেষ।



মরিচা পড়াটা দেখা দেয় ধাতুজারণের ফলে। লোহায় যে মরিচা পড়ে তার রাসায়নিক নাম হাইড্রেটেড ফেরিক অক্সাইড। অর্থাৎ ফেরিক অক্সাইডের সঙ্গে জলের অণু মিশে এক ধরনের যৌগের সৃষ্টি। এই যৌগ লোহার উপর সৃষ্টি হয়। লোহা ক্রমশঃ ক্ষয় হয় আর এই যৌগটি পরিমাণে বাড়তে থাকে। এর জন্য অবশ্য প্রয়োজন হয় বায়ু ও জলীয় বাষ্প—যা সর্বদাই অনায়াসে লোহা পেয়ে থাকে। এই ক্ষয়ের ফলে লোহার নিজের যেমন ক্ষতি হয়, তেমনি লোহার উপরে যারা আস্থা রাখে তাদেরও বিপদে পড়তে হয়। সে তার অক্সাইডে পরিণত হয়। এই অক্সাইডটি বাদামী রঙের এবং এটি ঝুরঝুরে হয়।

লোহার মত আর যেসব ধাতু এই ক্ষয়ের সঙ্গে পরিচিত তারা হচ্ছে তামা, টিন ও দস্তা। এইসব ধাতু মুক্ত অবস্থায় নিজেদের ধরে রাখতে পারে না, তার কারণ বায়ুর অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্প। এদের সংস্পর্শে তারা তাদের অক্সাইডে পরিণত হয়। এর ফলে জারিত ধাতু অনেক গুণ হারায়। কখনও কখনও দেখা যায় যে, সাধারণ ধাতুর যে সব গুণ ছিল, যেমন তার দৃঢ়তা, তড়িৎ ও তাপবহন ক্ষমতা সেগুলি ধাতুর অক্সাইড থেকে দূর হয়ে গেছে।

ধাতুর এই ক্ষয়কে সে কিন্তু নিজে বন্ধ করতে পারে না। তাই তার ক্ষয় ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না ধাতুটি পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রথমে কিছু অক্সিজেন অণু একাজে এগিয়ে আসে এবং ধাতুর উপর আটকে থাকে আর তার কাজে বায়ুর জলীয় বাষ্প সাহায্য করে। এতে অক্সাইডের পাতলা স্তর দেখা যায়। এই স্তর পুনরায় অক্সিজেনের আগমনকে সাহায্য করে আর তাই ধাতু ক্রমশঃ ক্ষয় হতে থাকে।

শুধু কি বায়ুর অক্সিজেন এইসব ধাতুর পেছনে লাগে? মোটেই না, অক্সিজেনের মত ধাতুর পেছনে লাগে ক্লোরিন, সালফার ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি গ্যাস। এরাও সুযোগ পেলে ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায়। আর তাই ধাতু সর্বদাই এদের ভয়ে ভীত। কিন্তু এদের হাত থেকে ধাতুর কি বাঁচার উপায় নেই?—আছে। এইসব বিক্রিয়া থেকে মুক্ত রাখতে ধাতুর উপর অন্য জিনিসের প্রলেপ দেওয়া হয়। বিশুদ্ধ লোহার জিনিস ব্যবহার করতে পারলে অবশ্য তাকে কেউ সহজে আক্রমণ করে না। কিন্তু বিশুদ্ধ লোহা পাওয়া দুষ্কর। আজকের দিনে তাই মিশ্রধাতুর জিনিসপত্র ব্যবহার করা হয়। তাই ষ্টেনলেস স্টিল, ব্রোঞ্জ, পেতল প্রভৃতির জিনিস ব্যবহার করা হয়।

লোহায় মরচে ধরা বিভিন্নভাবে রোধ করা সম্ভব। যেমন—

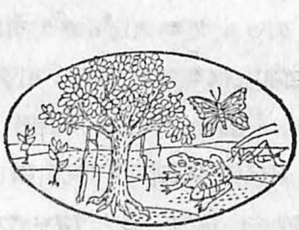
(১) লোহার উপরে রঙ, আলকাতরা, রেডলেড বা অ্যালুমিনিয়াম চূর্ণের প্রলেপ দিয়ে।

(২) লোহার উপর জিঙ্ক লেপন, টিনলেপন, ক্রোমিয়াম বা নিকেল প্রভৃতির প্রলেপ দিয়ে।

(৩) বিভিন্ন ধাতুর সঙ্গে বিভিন্ন অনুপাতে লোহা মিশিয়ে ধাতু সংকর (অ্যালয়) তৈরী করে। লোহা দিয়ে সাধারণত নিকেল, ক্রোমিয়াম প্রভৃতি ইস্পাত তৈরী করা হয়।

চিকিৎসার সাহায্যে মানুষ যেমন তার রোগকে দূরে ঠেলে শরীরকে ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচতে পারছে, তেমনি তার প্রয়োজনীয় সামগ্রীকেও সে নতুন সাজে সাজিয়ে সভ্যতার কাজে লাগাচ্ছে। ধাতুর ক্ষয়কে রোধ করা সম্ভব হওয়ায় যান্ত্রিক সভ্যতাও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

— —



আমাদের জীবনে কাচ

একটি ঘটনা দিয়েই শুরু করা যাক। ১৯৭৬ সালের শেষের দিকে বার্কলের একটি ব্যাংকে ঘটনাটা ঘটেছিল। ব্যাংকের গেটে ছিল প্রকাণ্ড এক কাঁচ। ভেতরের দিকে একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন সময় এক বুলেট সেই কাঁচকে ভেদ করে আঘাত করল তাকে। আর সেই আঘাতে মেয়েটি মারা গেল। এই ঘটনার পর থেকে উন্নত ধরনের কাঁচ সৃষ্টি করা হয়েছিল, যাতে করে সেটি বুলেট রোধ করতে পারে। ফ্রাংকফুটের ডেগুসা ফার্মে এই ধরনের কাঁচ তৈরী করা হচ্ছে।

সাধারণ কাঁচের সঙ্গে অবশ্য বুলেটরোধী কাঁচের খুব একটা পার্থক্য নেই। বুলেট রোধকারী কাঁচে রেজিন ব্যবহার করা হয়। সাধারণ কাঁচ স্বচ্ছ বা অর্ধস্বচ্ছ পদার্থ। এর নির্দিষ্ট কোন আকার নেই। শুধু তাই নয় এর নির্দিষ্ট কোন গলনাংকও নেই। উত্তপ্ত করলে ধীরে ধীরে নরম হয়ে সান্দ্র তরলে পরিণত হয়। নরম মাটিকে যেমন ইচ্ছে মত আকার দেওয়া যায়, নরম অবস্থায় ছাঁচের সাহায্যে কাঁচকেও বিভিন্ন আকার দেওয়া যায়। কাঁচকে প্রকৃতপক্ষে অতিশীতলীকৃত সান্দ্র তরল বলা হয়। রঙীন কাঁচ তৈরী করার সময় গলানো কাঁচের মধ্যে বিভিন্ন ধাতুর অক্সাইড মেশান হয়। লাল রঙের কাঁচের জন্য কিউপ্রাক অক্সাইড, সবুজ রঙের জন্য ক্রোমিয়াম অক্সাইড, নীল রঙের জন্য কোবাল্ট অক্সাইড ব্যবহার করা হয়।

পরীক্ষাগারে যখন আমরা তাকাই তখন আমরা কাঁচেরই

যন্ত্রপাতি বেশী দেখতে পাই। যেমন জানালার কাঁচ, টেষ্ট টিউব, প্রিজম, ব্যারোমিটার, দূরবীন, অনুবীক্ষণ, বুরেট, পিপেট প্রভৃতি। আমরা যে চশমার লেন্স ব্যবহার করি তাও কাঁচের সাহায্যে তৈরী হয়।

সাধারণ কাঁচ তৈরীর পদ্ধতি বহুকাল থেকেই জানা। সোডার সঙ্গে বালি মিশিয়ে সেটা গলিয়ে কাঁচ তৈরী করা হত মিশর দেশে। এই পদ্ধতি পরে ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ভারতে খৃষ্ট জন্মের আগেও কাঁচ তৈরীর নিয়ম জানা ছিল। কাঁচকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—নরম কাঁচ, শক্ত কাঁচ, ফ্লিন্ট কাঁচ, জেনা কাঁচ, বোতল কাঁচ ও পাইরেক্স কাঁচ। বিভিন্ন কাঁচের উপাদান বিভিন্ন। সাধারণত কাঁচে যে সব উপাদান থাকে সেগুলি হলো সোডা, পটাশ, বালি, রেডলেড, চুনা পাথর ও বিভিন্ন পদার্থ।

কাঁচ তাপের কুপরিবাহী। সুতরাং কাঁচ তৈরীর করার পর তা ঠাণ্ডা করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। ঠাণ্ডা করার সময় কাঁচের বাইরের অংশটি তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়ে কঠিন হয়, কিন্তু ভেতরের অংশ তখনও তরল থেকে যায়। এতে কাঁচের মধ্যে চাপ ও তাপের পার্থক্য থেকে যায় এবং তাতে কাঁচ ফেটে যায়। কাঁচের এই দোষকে তাড়ানোর জন্য কাঁচের কোমলায়ন প্রয়োজন। যে উষ্ণতায় এটি নরম হয়, কাঁচকে ঐ উষ্ণতায় গরম করে ধীরে ধীরে সমানভাবে ঠাণ্ডা করলে কাঁচের ঐ দোষ আর থাকে না। এবং এতে কাঁচে চিড় খায় না। কাঁচের সঙ্গে জল, বায়ু, অ্যাসিড এবং দুর্বল ক্ষার সাধারণত বিক্রিয়া করে না। তবে তীব্র ক্ষার এর সঙ্গে কিছুটা বিক্রিয়া ঘটায়। কাঁচের বিভিন্ন গুণ থাকায় সেটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এক বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

—

কার্বনডাই-অক্সাইড ও আগুন নেভানো যন্ত্র

আমরা যে বেঁচে আছি, তার জন্য যেমন প্রয়োজন হয় খাওয়া দাওয়ার, তেমনি প্রয়োজন হয় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার। প্রশ্বাসের সংগে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি, আর নিঃশ্বাসের সাহায্যে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস ত্যাগ করি। কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাসটি ঠিক বিষাক্ত নয়, তবে শ্বাসরোধী। বায়ুকে যেমন আমরা দেখতে পাই না, এই গ্যাসটিকেও আমরা দেখতে পাই না। আয়তন হিসেবে বায়ুতে এর পরিমাণ খুবই কম, শতকরা হিসেবে মাত্র ০·০৩ ভাগ। বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ যেমন চুনাপাথর, ডলোমাইট, ম্যাগনেসাইট প্রভৃতি থেকে এটি পাওয়া যায়। বিজ্ঞানী ল্যাঁভয়সিয়র প্রমাণ করেন যে এটি কার্বনের একটি অক্সাইড।

ক্ষার দ্রবণ গ্যাসটিকে শোষণ করতে পারে। গ্যাসটিকে উত্তপ্ত কয়লার মধ্য দিয়ে পাঠালে তা নিজের রূপ বদলে ফেলে আর কার্বন মনক্সাইড নামে এক বিষাক্ত গ্যাসে পরিণত হয়। কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাসটি জলে দ্রবণীয়। গ্যাসটি জলে মিশলে কার্বনিক অ্যাসিড নামে এক ধরনের অস্থায়ী অ্যাসিড তৈরী করে। তাই এই গ্যাসের জলীয় দ্রবণ আম্লিক। কিন্তু চুন-জলের সঙ্গে এই গ্যাসের বিক্রিয়াটি খুব মজার। চুন-জলের ভেতর গ্যাসটি পাঠালে চুন-জল ঘোলা হয়ে যায়। কিন্তু পরিমাণে বেশী পাঠালে চুন-জল আবার স্বচ্ছ হয়ে যায়। এর কারণ হল কার্বনডাই-অক্সাইড চুন-জলের সঙ্গে মিশে প্রথমে অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম কার্বনেট সৃষ্টি করে এবং পরে অতিরিক্ত গ্যাস এই কার্বনেটকে দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেটে পরিণত করে।

এই গ্যাসটি বায়ুর থেকে ভারী। এই ভারী হওয়ার জন্য গ্যাসটিকে আগুন নেবানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। আমরা জানি একজন মোটা লোক একজন রোগা লোককে সহজেই ধাক্কা মেরে তার জায়গা দখল করতে পারে। অর্থাৎ জোর যার মুল্লুক তার! আমরা যে বায়ুমণ্ডলে বাস করি সেখানেও এই নিয়ম কাজ করছে। অর্থাৎ ভারী গ্যাস হালকা গ্যাসকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। আর এই গুণের জন্য এই গ্যাসকে আগুন নেবানোর কাজে লাগানো হয়। তবে এটাই গ্যাসটির আসল ধর্ম নয়। আসল ধর্মটি হচ্ছে যে, গ্যাসটি নিজে জ্বলে না এবং অন্যকেও জ্বলতে সাহায্য করে না।

সিনেমা হলে, অফিসে মোচার মত লালরঙের আগুন নেবানো যন্ত্র দেখা যায়। এই যন্ত্রের মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকে, যাতে সহজেই কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি করা যায়। যন্ত্রটির মধ্যে একটি কাঁচের নল থাকে যার মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড রাখা হয়। যন্ত্রটির মধ্যে সোডিয়াম কার্বনেটের গাঢ় দ্রবণ রাখা হয়। যন্ত্রটির বাইরে একটি হাতল থাকে। এবার প্রয়োজনের সময় হাতলটিকে আঘাত করা হয় এবং তাতে ভেতরের কাঁচ-নলটি ভেঙ্গে যায়। কাঁচনল থেকে তখন সালফিউরিক অ্যাসিড বেরিয়ে এসে বাইরের সোডিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায় এবং তাতে প্রচুর কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। প্রচণ্ড চাপে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস এবং জল বেরিয়ে আসে, আর তাতে আগুন নিভে যায়। সালফিউরিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম কার্বনেটের বদলে ফটকিরি বা অ্যালুমিনিয়াম সালফেট এবং সোডিয়াম কার্বনেটের বিক্রিয়া ঘটিয়েও কার্বনডাই-অক্সাইড তৈরী করা যায়। এই গ্যাস ফেনাসমেত বেরিয়ে আসে আর ছোটখাট আগুন নিভে যায়।

——

গুড় ও চিনি

আমরা অনেকেই সন্দেশ খেতে ভালবাসি। এই সন্দেশ গুড় বা চিনির সাহায্যে তার মিষ্টত্ব লাভ করে। নলেন গুড়ের সন্দেশ অনেকেরই কাছে বেশ লোভনীয়। নলেন গুড় ছাড়া ভেলি ও খেজুর গুড়েরও কদর আছে। তবে ভেলি বা খেজুর গুড়ের চেয়ে চিনির কদর অনেকের কাছে বেশি। এর কারণটা হল চিনির সাদা রঙ। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ১০০ গ্রাম গুড়ে প্রায় ৭৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম থাকে। এছাড়া গুড়ে থাকে খুব কম পরিমাণে লোহা, তামা, ফসফরাস, গ্লুকোজ, ভিটামিন প্রভৃতি। কিন্তু চিনিতে এসব ধাতু ও ভিটামিন নেই। তাই চিনির মোহ ত্যাগ করে গুড়কে গ্রহণ করলে, আমরা বেশি পুষ্টিকর খাদ্য পাব। একমাত্র যেসব স্থানে চিনির একান্ত প্রয়োজন, সেখানে ছাড়া অন্যত্র গুড়কে মিষ্টি হিসেবে গ্রহণ করা লাভজনক হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চিনি প্রস্তুতিতে খরচ বেশি পড়ে বলে এর দামও বেশি হয়।

সাধারণত আমরা আখ থেকে চিনি পেয়ে থাকি। আখ টুকরো টুকরো করে চিনি-কলে এনে পেষণ যন্ত্রের সাহায্যে তার থেকে রস বের করা হয়। এই রসের সঙ্গে চুন মেশালে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো চুনের সঙ্গে আটকে যায়। এরপর যে রস পড়ে থাকে, তাকে ক্রমশঃ গাঢ় করা হয়। এই ঘনরসকে বায়ুশূন্য পাত্রে গরম করলে বাদামী রঙের চিনির কেলাস আর তরল মোলাসেস (চিটাগুড়)

পাওয়া যায়। সেন্ট্রিফিউজ যন্ত্রের সাহায্যে চিনির দানাকে আলাদা করা হয়। বাদামী রঙের চিনিকে উপযুক্ত দ্রাবকে বার বার দ্রবীভূত করে অপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাদামী রঙটা তাড়াবার জন্য কাঠকয়লার সাহায্য নেওয়া হয়। কাঠকয়লা এর রঙটাকে দূরে করে। এরপর একে বায়ুশূন্য পাত্রে কেলাসিত করে সাদা পরিষ্কার চিনি পাওয়া যায়। আখ দিয়ে শুধুমাত্র চিনিই তৈরী হয় না, এর থেকে গুড়, মিছরি, মাদকদ্রব্য, কাগজ ও সার পাওয়া যায়। অনেক দেশে আখের ফলন না থাকায়, সেসব স্থানে বীটের থেকে চিনি প্রস্তুত করা হয়।



আমাদের জীবনে ... ক্যালসিয়াম

প্রকৃতির বিচিত্র রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত। কোথাও কোথাও ছোট-বড় পর্বতমালা আর কোথাও কোথাও নদ-নদী, সাগর। এই পাহাড় বা নদী তার রূপ যেমনই হোক না কেন, সেখানে পাওয়া যায় নানা ধরনের মৌল ও যৌগের সন্ধান। এইসব মৌলের মধ্যে একটি প্রধান স্থান দখল করে রেখেছে ক্যালসিয়াম। এটি একটি ধাতু। এই ধাতুর যৌগ পাহাড়ের একটা প্রধান অঙ্গ। সমুদ্রের নানা প্রাণীর মধ্যেও এই ক্যালসিয়াম যৌগের প্রাধান্য। প্রকৃতির সঙ্গে তাই তার এত সখ্যতা, বন্ধুত্ব।

এই ধাতুটি বিভিন্ন যৌগ গঠন করে। এর একটি প্রধান যৌগ হচ্ছে ক্যালসিয়াম ফসফেট যা আমাদের শরীরে বেশ ভালো পরিমাণে থাকে। এর মূল আকর হচ্ছে ক্যালসাইট। ক্যালসাইট থেকে এটি নিষ্কাশিত হয়েছিল, তাই এর নাম ক্যালসিয়াম। ১৮০৮ সালে বার্জেলিয়াস, পনটিন এবং ডেভি এই মৌলটি আবিষ্কার করেন। চুন, চুনাপাথর, চক প্রভৃতি হচ্ছে ক্যালসিয়ামের যৌগ। সুপার ফসফেট অফ লাইম যা সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়, আসলে তা ক্যালসিয়াম-ঘটিত যৌগ। আমরা যে দুধ খাই তার মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম।

শরীরে যে সব ধাতব পদার্থ আছে, তার মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (শতকরা প্রায় ২ ভাগ)। শরীরের পুষ্টিসাধনে এর মূল্য খুব বেশি। মানুষ এবং অনেক প্রাণীর হাড় ও দাঁতের গঠনে এর বিশেষ ভূমিকা আছে। প্লাষ্টিক শিল্পে বিভিন্ন পদার্থ উৎপাদন করতে নাইট্রোলিম প্রয়োজন হয়। এই নাইট্রোলিম হচ্ছে ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড। এটি সার হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। ক্যালসিয়ামের দুটি অতি পরিচিত যৌগ হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা বাখারি চুন এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচুন। পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট, মর্টার প্রভৃতি প্রস্তুত করতে কলিচুন ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন গ্যাস, তরল এবং কঠিন পদার্থকে শুকনো করার জন্য ল্যাবরেটরিতে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করা হয়। মার্বল পাথর, কাঁচ, প্লাষ্টার অফ প্যারিস, জিপসাম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি হচ্ছে ক্যালসিয়ামের যৌগ। শামুকের খোলটি এবং মুক্তা হচ্ছে ক্যালসিয়ামের কার্বনেট। বিভিন্ন ধাতুসঙ্কর বা অ্যালয় ক্যালসিয়াম দিয়ে প্রস্তুত করা যায়।

আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্যালসিয়াম ছড়িয়ে আছে, তবে মূলতঃ এটি হাড়ের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছে। দাঁত এবং হাড়ের মধ্যে থাকে ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড।

ক্যালসিয়াম আমাদের শরীরে নানাভাবে কাজ করে। মাংসপেশীর প্রসারণ ও সংকোচনের কাজে, দেহের অস্থিমজ্জা গঠনের কাজে, বিভিন্ন কোষের সংযুক্তি সাধনে এবং রক্তকে জমাট বাঁধানোর কাজে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া পরিপাকের কাজে, ফুসফুস থেকে মাংস-পেশীতে অক্সিজেন যোগান দেওয়ার কাজে, শরীরে উৎপন্ন কার্বনডাই-অক্সাইডকে তাড়ানোর কাজে এর প্রয়োজন খুব বেশি। সুতরাং শরীরকে মজবুত রাখতে গেলে শরীরে ক্যালসিয়ামের যোগান সর্বদা

অব্যাহত রাখতে হবে। আর তাই যে সব খাদ্যে ক্যালসিয়াম আছে সে রকম খাদ্য যেমন—দুধ, গুড়, ঢ্যাঁড়স, কফি, বরবটি, মটর, ডিমের কুসুম প্রভৃতি খেতে হবে। এছাড়া রুই, ভেটকি, কাতলা, কৈ প্রভৃতি মাছ খেলেও শরীরে ক্যালসিয়ামের প্রবেশ ঘটবে।

ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্থিযক্ষ্মা, দাঁতের ক্ষয় হয়। এবং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস পায়। সেজন্য গড়ে আমাদের প্রত্যহ প্রায় ০·৫ গ্রাম ক্যালসিয়াম দরকার। এই ক্যালসিয়াম শরীরে আমরা প্রধানত দুধ থেকে পেতে পারি। এছাড়া অনেকে পানের সঙ্গে চুন খান, সেই চুনের মাধ্যমে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি অনেকটা পূরণ হতে পারে। দই, ছানা প্রভৃতির মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে এবং এই অ্যাসিড ক্ষুদ্রান্ত থেকে শরীরে ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে।

আমরা জানি দেহের বিভিন্ন অংশের হাড়কে শক্ত করার কাজে ক্যালসিয়াম লাগে কিন্তু দেহে মলিবডেনাম, স্ট্রনসিয়াম প্রভৃতি ধাতু প্রবেশ করলে, এই ধাতুগুলি শরীরে ক্যালসিয়ামের প্রবেশে বাধা দেয়। মলিবডেনাম বেশি পরিমাণে দেহে প্রবেশ করলে টিয়ার্ট নামে একটি রোগের সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই মৌলটি বিভিন্নভাবে শরীরে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তবে ক্যালসিয়াম শরীরে খুব সহজে মিশে যেতে (assimilate) পারে না। অম্লতা ও ক্ষারতারও এক বিশেষ ভূমিকা আছে। যখন বেশি পরিমাণ ফসফেট শোষিত হয় তখন ক্যালসিয়াম ফসফেট উৎপন্ন হয় এবং এটি অম্ল মাধ্যমে দ্রবণীয়। সুতরাং অম্ল মাধ্যম ক্যালসিয়াম গ্রহণে সাহায্য করে।

বৃক্কতে ক্যালসিয়াম লবণ যদি জমা হয় তবে সেখানে পাথর সৃষ্টি হতে পারে। তাই প্রস্রাব পরীক্ষা করে এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা যেতে পারে। অনেক সময় বেশি পরিমাণ ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ শরীরে উন্নতির চেয়ে অবনতি ঘটাতে পারে। কারণ এই ক্যালসিয়াম যদি ঠিকভাবে পরিপাক না হয় তবে

হৃদরোগ, নার্ভের দোষ এবং শরীরের সাম্যতা নষ্ট হতে পারে। তাই শরীরের বাড়ন্তকালে ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। ঠিকভাবে পরিশ্রম করলে শরীরের হাড় মজবুত থাকে এবং তা রুগ্ন হয় না। যৌবনকালে একজন মানুষের মোটামুটি দৈনিক 0·6 গ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়। একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন আরও বেশি হয় এবং তার পরিমাণ 1·5 থেকে 2 গ্রাম মতো হতে পারে। খাদ্য থেকে উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম সংগ্রহ করা না গেলে, ডাক্তাররা অনেক সময় ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তাই প্রকৃতির এই মৌলটির গুরুত্বের কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে।

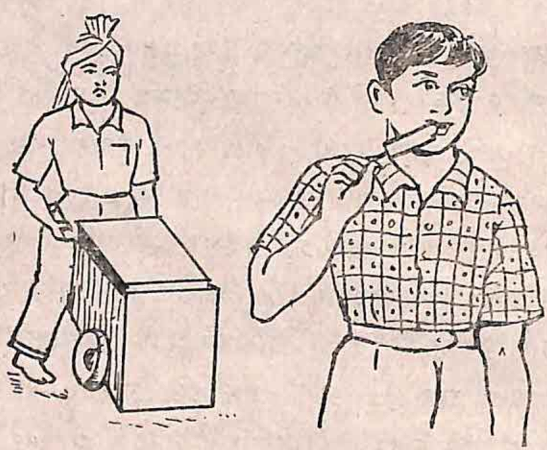


নানারূপ বরফ

হিমালয় বা উঁচু উঁচু পাহাড়ের চূড়োয় তাকালে আমরা দেখতে পাব শুধু বরফ আর বরফ। সেই বরফ যখন তাপ পায় তা গলতে শুরু করে, আর তা থেকেই পাওয়া যায় জল। সে জল খুব ঠাণ্ডা। বরফের সঙ্গে লবণ মিশিয়ে আমরা হিমমিশ্রণ তৈরী করতে পারি। এই হিমমিশ্রণের উষ্ণতা জিরো ডিগ্রীর অনেক নীচে এবং তার মান –২৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের মতো। সাধারণত উষ্ণতা জিরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হলে বরফ জলে পরিণত হয়। আর জিরো ডিগ্রী বা তার নীচে জল কঠিন অবস্থায় অর্থাৎ বরফ হয়ে থাকে। তবে কি বরফকে জিরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের বেশী উষ্ণতায় কঠিন অবস্থায় রাখা যাবে না? যাবে। তার জন্য চাই উপযুক্ত চাপ। বিজ্ঞানী ব্রিজম্যান দেখিয়েছেন যে প্রায় ২১০০০ বায়ুচাপে বরফ ৭৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় থাকে। চাপ বাড়ালে আরো বেশী উষ্ণতায় বরফকে রাখা যায়। ৩২০০০ বায়ুচাপে বরফকে ১৯০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় রাখাও সম্ভব হয়েছে। এই ৭৬ বা ১৯০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় আমাদের হাত পুড়ে যায়, তাই এই বরফকে আমরা সহজেই গরম বরফ বলতে পারি। গরম বরফের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১'০৫ এবং সেজন্য তা সাধারণ বরফের মত জলে ভাসে না। ৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব হচ্ছে সব চেয়ে বেশী এবং তখন তা এক ধরা হয়। অন্য উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব কিছু কম।

বরফ জলে ভাসে। কারণ, বরফের ঘনত্ব জলের ঘনত্বের চেয়ে কম। জল যখন বরফে পরিণত হয়, তখন আয়তন বেড়ে যায়।

দেখা গেছে জলের আয়তন যদি ১১ সিসি হয় এবং তার থেকে জিরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় যে বরফ পাওয়া যায়, তার আয়তন হয় ১২ সিসি। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায় যে, বরফ গলে যখন জল হয় তখন উষ্ণতায় পরিবর্তন হয় না। জিরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় বরফ থেকে ঐ উষ্ণতার জল পাওয়া যায়। এই পরিবর্তনে যে তাপের প্রয়োজন হয়, সেই তাপকে বলে লীনতাপ। এই তাপ উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটায় না। এক গ্রাম বরফকে জিরো ডিগ্রী উষ্ণতায় জলে পরিণত করতে তাপ লাগে ৮০ ক্যালরি। তাপের একক হচ্ছে



ক্যালরি। সাধারণ জলের চেয়ে বরফগলা জলের স্বাদ বেশী, এর কারণ হচ্ছে বরফগলা জলে বরফের কাঠামো কিছু সময় ধরে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই জল শরীরের পক্ষে বেশী উপকারী। শরীরের কোন অংশে ব্যথা পেলে বা রক্ত বন্ধ করার কাজে আমরা বরফ ব্যবহার করে থাকি। বেশী জ্বরে মাথা বা শরীর ঠাণ্ডা করার কাজেও এটি কাজে লাগে।

বরফ অঞ্চলের ছেলেমেয়েদের বরফ নিয়ে খেলা করতে দেখা যায়। তারা দু'টুকরো বরফকে চাপ দিয়ে জোড়া লাগিয়ে একটা বড় আকারের বরফ তৈরী করতে পারে। কোন কঠিন জিনিস একবার ভেঙ্গে গেলে

তার টুকরোগুলো চাপ দিয়ে কি জোড়া লাগান যায়? না—মোটেই না। কিন্তু বরফের ক্ষেত্রে এটা সম্ভব। বরফকে আছড়ে ভাঙ্গাও যেমন সম্ভব, তেমনি ছ'টুকরো বরফের মধ্যে জোড়া দেওয়াও সম্ভব। এর কারণটা হচ্ছে যে, চাপ বৃদ্ধির সঙ্গে বরফের গলনাংক কমে যায়, আর তাতে বরফ জলে পরিণত হয়। আবার চাপমুক্ত হলে গলনাংক আবার বেড়ে যায়, আর তাতে কঠিন বরফ ফিরে আসে। এই গুণের জন্য এক বড় আকারের বরফকে একটা টানটান করা তার দিয়ে কাটা যায়। বরফের প্রথমে তরলে পরিণত হওয়া এবং আবার কঠিনে ফিরে আসাকে পুনঃশিলীভবন বলে। এই গুণের কথা ছোটদের জানা না থাকলেও এই গুণটিই কিন্তু তাদের আনন্দের কারণ হয়ে থাকে।

এবার আর এক ধরনের বরফের কথায় আসা যাক। এই বরফ জল দিয়ে তৈরী নয়। তাই এটিকে শুকনো বরফ বলে। এতে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলন হয় না। (মিলন হয় কার্বন ও অক্সিজেনের।) কার্বনডাই-অক্সাইড স্বাভাবিক উষ্ণতায় একটি গ্যাস। ৩১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের নীচে বেশী চাপে এই গ্যাসটিকে তরলে পরিণত করা যায়। সাধারণ চাপে তরল কার্বনডাই-অক্সাইড পাওয়া যায় না। কঠিন কার্বনডাই-অক্সাইডকে সাধারণ উষ্ণতায় ও চাপে উর্দ্ধপাতিত করে সরাসরি গ্যাসে পরিণত করা হয়। এই কঠিন কার্বনডাই-অক্সাইডকে শুকনো বরফ বলে। এটি হিমায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। জল থেকে যে বরফ পাওয়া যায়, তাও যেমন ঠাণ্ডা করার কাজে লাগান হয়, শুকনো বরফকেও সেই ঠাণ্ডা করার কাজে ব্যবহার করা যায়, তবে তা অন্যভাবে।

সুতরাং বরফকে আমরা তিনভাবে পেলাম। কখনও সে ঠাণ্ডা, কখনও গরম আবার কখনও বা শুকনো। শুধু নামে নয়, ব্যবহারের দিক দিয়েও তারা কিছু পার্থক্য বজায় রেখেছে।

—

মশা ও তার আধুনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

এক ধরনের পতঙ্গ আছে, যাদের সঙ্গে মশার খুব ভাব। এই পতঙ্গগুলি বিভিন্ন গুহায় থাকে। তারা অন্ধকারে থাকতে থাকতে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে। তাই মশার সঙ্গ তারা চায়। মশা যে আলো দেয়, সেই আলোতে তারা তাদের শিকার খোঁজে। জোনাকী পোকার সঙ্গে পতঙ্গগুলোর বন্ধুত্ব আছে কিনা জানা যায় নি। এইসব পতঙ্গের বন্ধু মশার কথা আমরা ভালভাবেই জানি। পতঙ্গের সঙ্গে মশার সম্পর্ক যেমন হোক না কেন, মানুষের সঙ্গে মশার এখন পর্যন্ত আড়ির সম্পর্ক আছে। পল্লী অঞ্চলের ঝোপঝাড়, নালা, নর্দমা প্রভৃতি স্থানে এরা তো আমাদের দেশে একছত্র অধিকার করে রেখেছে অনেককাল থেকেই। এখন এরা ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে শহরের দিকে।

অন্যান্য পতঙ্গের মতো মশার জীবনেও চারটি দশা আছে। (১) ডিম (২) শূককীট (৩) পিউপা এবং (৪) পূর্ণাঙ্গ মশা। পূর্ণাঙ্গ দশায় সে ডানা মেলে শূন্যে উড়ে বেড়ায় আর স্থলে বসবাস করে। এর আগের দশাগুলোতে সে জলেতেই কাটায়। মশাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (১) অ্যানোফিলিস (২) কিউলেক্স এবং (৩) এডিস্।

অ্যানোফিলিস ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু, কিউলেক্স গোদ বা শ্লীপদ (Elephantiatis) রোগের জীবাণু এবং এডিস্ ডেঙ্গু বা পীতজ্বরের জীবাণু বহন করে।

মশার মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ দুটি ভাগ আছে। তবে মানুষ স্ত্রীমশাকে ভাল করে চেনে। কারণ, তারাই মানুষকে কামড় দিয়ে তার শরীর থেকে রক্ত শুষে নেয়। পুরুষ মশা এদিক থেকে তুলনামূলকভাবে আমাদের কাছে ভদ্র ও নিরীহ বলা যেতে পারে। তারা ফল ও পাতার রস প্রভৃতি পান করে সন্তুষ্ট থাকে।

স্ত্রীমশা যখন কোন রোগাক্রান্ত মানুষকে কামড়ে সুস্থ মানুষকে কামড়ায় তখনই সুস্থ মানুষ অসুস্থ হতে পারে। অ্যানোফিলিস ও কিউলেক্স মশার মধ্যে কিছু কিছু আকৃতিগত ও স্বভাবের পার্থক্য আছে, যার দ্বারা আমরা তাদের চিনতে পারি। অ্যানোফিলিস মশকীর হুলটি শুঁয়ায় ঢাকা থাকে এবং এর দুই পাশে দুটি শুঁড় থাকে। কিন্তু কিউলেক্স মশকীর এ ধরনের শুঁড় নেই। হুলের প্রথম অংশটি কিউলেক্সের ক্ষেত্রে শুঁয়ায় ঢাকা থাকে। অ্যানোফিলিস মশার ডানাতে কোন সাদা কালো দাগ থাকে না; কিন্তু কিউলেক্সে এরকম দাগ দেখা যায়। অ্যানোফিলিস রাত্রে উড়ে বেড়ায় এবং ওড়ার সময় কোন আওয়াজ শোনা যায় না। কিন্তু কিউলেক্স মশার উৎপাত দিনরাত লেগেই আছে। কিউলেক্স ও অ্যানোফিলিস-এর বসার ভঙ্গিও আলাদা। অ্যানোফিলিসের দেহের পেছনের অংশ উঁচু থাকে এবং কিউলেক্স কুঁজ বের করে বসে ও পিঠ উঁচু করে দেহটি ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল রাখে।

গত তিনহাজার বছর ধরে ম্যালেরিয়া রোগটি মানুষের কাছে বেঁচে আছে। এর বিরুদ্ধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনেক ব্যবস্থা নিয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে একে নির্মূল করা সম্ভব হয় নি। ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সাহায্যে ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ

সূচী চালু হয়েছিল। এই সময়ে ভারতে লক্ষ লক্ষ লোক ম্যালেরিয়ার প্রকোপে মারা যায়। ১৯৭০ সালের একটি রিপোর্টে দেখা যায় যে, ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। অ্যানোফিলিস মশার হাত থেকে রোগীকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে, এই রোগের বিস্তার ঠেকান যায়। জীবাণু রক্তে মিশলে তবেই একজন সুস্থ লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে। রক্তে এই জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটায় মশা। এই মশাকে মারার জন্য একটি প্রধান কীটনাশক দ্রব্য হল ডি. ডি. টি.। ডি. ডি. টি. ঘরের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিলে মশা জব্দ হয়। কারণ, এই কীট-



নাশক দ্রব্য মশাকে স্পর্শ করলে, সে বিষক্রিয়ায় মারা যায়। সুতরাং ডি. ডি. টি'র সাহায্যে এই রোগের সংক্রমণ অনেকটা রোধ করা যায়। বর্তমানে মশা তাড়ানো ক্রীম অনেকে ব্যবহার করে থাকেন। এটি শরীরের নানাস্থানে মেখে রাখলে মশা আর শরীরে বসে না। এইসব ক্রীম প্রস্তুতকারকগণ দাবী করেন যে, এই ক্রীম শিশুদের চামড়ায়ও নিরাপদ। এই ক্রীমের একটি প্রধান উপাদান হলো থ্যালেট এসষ্টার (ডাই-মিথাইল থ্যালেট। DMP, এছাড়া ম্যালেরিয়া রোগীকে ওষুধ খাইয়ে এই রোগের জীবাণু নষ্ট করা যায়। অনেক সময় ডি.ডি.টি, মশা

প্রতিরোধ করতে পারে না, তখন গ্যামাক্সেন (বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড) ব্যবহার করা যেতে পারে।

মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এমন এক পদ্ধতি বার করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, যার ফলে পরিবেশ কলুষিত হবে না এবং যে সব জাতের কীট-পতঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক কীটঘ্ন দ্রব্য প্রতিরোধের ক্ষমতা আছে, তাদেরও নষ্ট করা যাবে। ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সেস (N.A.S.) তার এক প্রতিবেদনে মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য এই গবেষণার কথা জানিয়েছে। এই প্রতিবেদনে মশা নিয়ন্ত্রণের তিনটি উপায়ের কথা বলা হয়েছে। (১) জৈবব্যবস্থা (২) রাসায়নিক বস্তুর সাহায্যে বিনাশ ব্যবস্থা ও (৩) মশার উৎপাদন স্থানের বিনাশ। উৎপাদনস্থানের বিনাশ বলতে বোঝায় জলাজমির জল বের করে ফেলা কিংবা তাতে মাটি ফেলা। যে যে পদ্ধতিতে রোগবাহী মশা নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেগুলি হল—

(ক) রোগবাহী মশার শূককীট মেরে ফেলতে পারে এমন জাতের মশার চাষ করতে হবে। লোকালয় থেকে দূরে যেখানে বদ্ধ জলাশয় আছে, সেখানকার মশা মারার জন্য এ-পদ্ধতি কাজে লাগান যেতে পারে।

(খ) পুকুর, ধানক্ষেত প্রভৃতি যেসব স্থানে জল আটকে থাকে, সেখানে এমন জাতের মাছ ছাড়তে হবে, যাতে তাদের বাচ্ছারা মশার ডিম ও শূককীট খেয়ে ফেলতে পারে।

(গ) জলাভূমিতে এমন সব জলজ উদ্ভিদের চাষ করতে হবে, যাদের থেকে নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থ জলে মিশে মশা মেরে ফেলে। অনেক সময় উদ্ভিদ থেকে এক ধরনের আঠা বেরিয়ে আসে এবং সেই আঠায় মশা আটকে গিয়ে জলাজমির জলে ডুবে মরে যায়।

(ঘ) জৈবিক পরিবর্তনের দ্বারা নির্বীজ পুরুষ মশার সৃষ্টি করতে হবে এবং তা বংশবৃদ্ধি করতে পারবে না। এই ধরনের মশার চাষ

করে সেগুলিকে ছেড়ে দিতে হবে। এতে মশার বংশ ধীরে ধীরে লোপ পাবে। এছাড়া এমন সব মশা সৃষ্টি করতে হবে যারা রোগবাহী মশার সঙ্গে মিলিত হয়ে বংশবৃদ্ধি করতে না পারে।

(ঙ) মশা ধ্বংস করতে পারে এমন সব পরভৃতিক ছত্রাক মশার উৎপত্তি স্থানে ছড়িয়ে দিলে সেগুলি মশার শূককীট নষ্ট করে ফেলবে।

(চ) মশা যেখানে ডিম পাড়ে, সেখানে প্রচুর পরিমাণে পরভৃতিক কীটাণু ছড়িয়ে দিলে সেগুলি মশার ডিম নষ্ট করতে পারবে।

(ছ) যেসব স্থানে মশার বংশবৃদ্ধি হয় সেখানে এমন সব ক্ষুদ্রকীট ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে তারা মশার ডিম ও শূককীট খেয়ে ফেলতে পারে।

(জ) যেসব রাসায়নিক পদার্থ মশার দৈহিক পরিণতি ও বাড় নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তা মশার শূককীটের ওপর ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।

উপরোক্ত পদ্ধতিগুলি কার্যকর হলে মশাকে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। মশা কোন পতঙ্গকে আলো দিয়ে যদি তার উপকার করে, তা ওই কীটের পক্ষে ভাল সন্দেহ নেই। কিন্তু রোগের হাত থেকে বাঁচতে গেলে মশার বিনাশ একান্তই প্রয়োজন।

আলট্রাসোনিক শব্দের সাহায্যে মশা তাড়ানোর প্রচেষ্টা সফল হবার সংবাদ পাওয়া গেছে। মানুষ ২০ থেকে ২০,০০০ হার্জ মধ্যে কম্পনশীল বস্তুর শব্দ শুনতে পারে। এর বাইরের কম্পনযুক্ত শব্দের নাম আলট্রাসোনিক। পরীক্ষায় দেখা গেছে, মশা এই শব্দের ভয়ে পালিয়ে যায়। সম্প্রতি জহরলাল ইনস্টিটিউট অফ্ পোষ্ট গ্রাজুয়েট্ মেডিক্যাল এডুকেশন এণ্ড রিসার্চ (JIPMER)-এর একদল বিশেষজ্ঞ প্রমাণ করেন যে মশা কুষ্ঠরোগ ছড়াতে পারে না।

—

আমরা দূষিত
মুক্তি কিভাবে?

একজন মানুষ অন্যমানুষের রক্ত কি পান করতে পারে? স্বভাবতই উত্তর হবে, না। কারণ, একজন সুস্থ, সভ্যমানুষের বিবেকই তাকে একাজে বাধা দেবে। কাপালিকদের নরবলি প্রথা এখন প্রায় বন্ধ। কিন্তু এমন একজন মানুষ আছে, মানুষের রক্ত পান করাটা হচ্ছে তার নেশা। বছর তিনেক আগে পশ্চিম জার্মানীর ফ্রাংকফুর্টে একজন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল ঠিক এই অপরাধে! অর্থাৎ তার অপরাধ ছিল, সে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শরীর থেকে রক্ত ইনজেকশন করে বোতলে সংগ্রহ করত এবং তা পান করত।

এই ধরনের মানুষকে জব্দ করা যায় এবং তার বদ নেশা বন্ধ করার উপায়ও আছে। অল্পসংখ্যক মানুষের বদখেয়ালকে বন্ধ করে সমাজের কলুষতা বন্ধ করা যদিও বা সম্ভব, কিন্তু বিভিন্নভাবে পরিবেশ যেভাবে দূষিত হতে চলেছে, তার হাত থেকে মুক্তি কিভাবে পাওয়া যাবে, তা আজকের দিনে এক বাস্তব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চারিদিকে বাড়ির পর বাড়ি নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতি বাড়ির মধ্যে কোন ফাঁক নেই বললেই চলে। প্রকৃতির আলো হাওয়ার সঙ্গে এই বাড়িগুলোর বাসিন্দাদের যেন আড়ি। এ ধরনের পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়া অনেকের পক্ষেই এখন আর সম্ভব নয়।

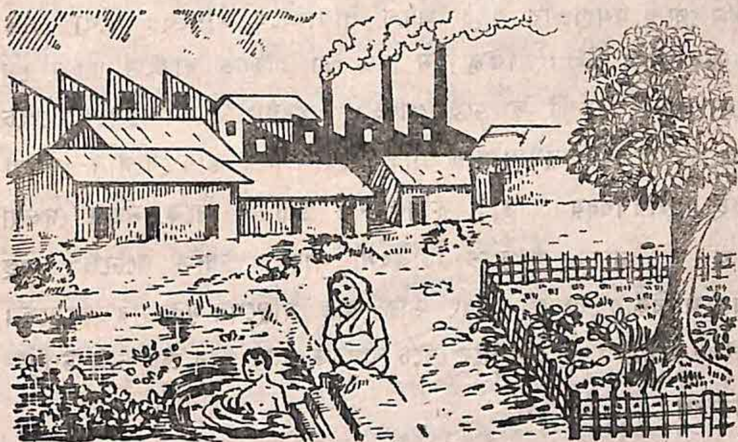
জনবহুল বিভিন্ন শহরের বহু জায়গারই এই হাল। এই বাড়িগুলোকে আবার কলকারখানার ধোঁয়া অনেক সময় গ্রাস করে নেয়। এহেন পরিবেশ থেকে অনেক মানুষ মুক্তি পেতে চলে আসেন সমুদ্র তীরে বা পাহাড়ের কোলে। কিন্তু এভাবে তো আর মুক্তি আসে না। তার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি।

রাস্তাঘাট, গাছপালা, ঘর-বাড়ি, জল, আলো, হাওয়া, এসব নিয়েই পরিবেশ। তাই সুন্দর জীবন-যাপনের জন্য চাই সুন্দর পরিবেশ। বায়ুমণ্ডলকে নিয়ে যদি বিচার করি, সেখানে নানা গ্যাসের সন্ধান আমরা পাই। বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা প্রায় ২০ ভাগ। এই গ্যাস দহন এবং প্রশ্বাসের কাজে ব্যবহৃত হয়। যদি কোনো কারণে এর পরিমাণ বেড়ে যায়, তবে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে যে সাম্যাবস্থা বজায় থাকে, তার ব্যাঘাত ঘটবে। অক্সিজেনের পরিমাণ বেশী বাড়লে আগুন সহজে নিববে না। আবার যদি অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়, তবে প্রশ্বাসের কাজে বাধা সৃষ্টি হবে। প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হলেই পরিবেশ দূষিত হয়ে ওঠে।

আজকের দিনে নগর সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কলকারখানার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কারখানার চিমনির ধোঁয়া, বিভিন্ন গাড়ির ধোঁয়া পরিবেশের বায়ুকে দূষিত করে ফেলছে। কলকারখানার বিভিন্ন জঞ্জাল নদীতে বা সাগরে মিশে সেই জলকে বিষাক্ত করে তুলছে। জ্বালানীর যোগান দিতে গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে। একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্য দিকে গাছপালার বিনাশ প্রকৃতির চিত্রকে বদলে দিচ্ছে। তাই বিভিন্নভাবে পরিবেশ ক্রমশঃ বিষাক্ত হয়ে উঠছে।

সূর্য থেকে যে তাপ ও আলো পৃথিবীর বুকে আসছে, তার প্রয়োজন আমাদের কাছে খুব বেশী। নইলে পৃথিবীতে মানুষের বসবাস অসম্ভব হয়ে উঠত। এই সূর্য থেকে আবার যে অতিবেগুনি রশ্মি আসে তাও

আবার জীবজগতের পক্ষে ক্ষতিকর। বায়ুমণ্ডলের একটা নির্দিষ্ট স্তরে ওজোন গ্যাস থাকে। এই ওজোন গ্যাস অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে। সুতরাং এই গ্যাস যতদিন ওই স্তরে পরিমাণমত থাকবে, ততদিন অতিবেগুনি রশ্মির থেকে জীবজগতের ক্ষতির আশঙ্কা নেই। বায়ুতে ওজোনের পরিমাণ যদি সামান্য বেড়ে যায়, তখন আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। বিভিন্ন কলকারখানার বিদ্যুৎ উৎপাদন-



কালে অনেক সময় ওজোন গ্যাস তৈরী হয়। এই অতিরিক্ত ওজোন গ্যাস স্বাস্থ্যের বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

সারাবিশ্বে জনসংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে শিল্পের প্রসার স্বভাবতই ঘটবে। পরিকল্পনাহীন কলকারখানার প্রসার যত ঘটবে— পরিবেশ ততই দূষিত হবে। বিভিন্ন গাড়ি, যেমন কয়লাচালিত রেলগাড়ি, ডিজেল ও পেট্রোলচালিত গাড়ি, উড়োজাহাজ প্রভৃতির ধোঁয়া বায়ুকে বিষাক্ত করে তোলে। মানুষ যে ধূমপান করে, তার ধোঁয়ায় থাকে নিকোটিন। তা বায়ুকে দূষিত করে। এই দূষিত বায়ুতে আমরা শ্বাস গ্রহণ করি। এর ফলে শরীরে কার্বন কণা ও ধূলিকণা প্রবেশ করে এবং ফুসফুসের ক্ষতিসাধন করে। শব্দের মাত্রাও

বেশী হলে তা পরিবেশ কলুষিত করে। বেশী জোরের শব্দ অনেকের হৃদরোগ ও অত্যধিক রক্তচাপের কারণ হয়ে উঠতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে বিকট শব্দ যথেষ্ট ক্ষতি করে।

কলকারখানার ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে এবং তার জঞ্জাল নদী বা সাগরে মিশতে না দিলে পরিবেশকে অনেকটা ভাল রাখা যাবে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ না ঘটানোর দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। এখন থেকে দশহাজার বছর আগে সারাবিশ্বে মানুষের সংখ্যা এক কোটিরও কম ছিল। কিন্তু দিন দিন তা বাড়তে বাড়তে এখন সে সংখ্যা ৪০০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং এত মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে যে পরিমাণ খাদ্য প্রতি বছর লাগবে তার যোগান দেওয়া খুবই চিন্তার বিষয়। তাই কৃষিকার্যের উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি ঘটেছে। বহু ওষুধ আবিষ্কার হয়েছে এবং তার জন্য মানুষের মৃত্যুহার কমেছে। এইসব মানুষ যাতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে তার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ।

গাছ বায়ুমণ্ডলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার চেষ্টা করে। বায়ুর কার্বনডাই-অক্সাইডকে সে গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছাড়ে। এর ফলে প্রকৃতিতে অক্সিজেনের অভাব ঘটে না। বায়ুর মধ্যে ভাসমান ধুলিকণা গাছের পাতায় আটকে যায়। পাতার উপরভাগে যে সব রন্ধ্র থাকে সেগুলি বুজে যায়। এতে গাছের আয়ু কমে যায়। তবে দেখা গেছে যে সব গাছ বেশী বছর বাঁচে তাদের পাতার রন্ধ্রগুলি নিচের দিকে থাকে, এতে সেখানে ধুলিকণা জমার সুযোগ কম। পাতার পক্ষে তার স্বাভাবিক কাজ করে যাওয়া সম্ভব হয়। তবে কলকারখানার কাছে যেখানে ধোঁয়া অনবরত বেরোয় সেখানে এসব দীর্ঘজীবি গাছের আয়ু কমে যায়। ধুলিকণা পাতার উপর ও নীচে জমা হয় এবং পাতার স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত ঘটে। তাই গাছপালার সংখ্যা কমে গেলে,

পরিবেশের ধুলিকণা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সে স্থানের মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়। সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

মানবসভ্যতার বিকাশ যেদিন থেকে ঘটেছে, অর্থাৎ মানুষ যেদিন থেকে আগুন জ্বালাতে শিখেছে, সেদিন থেকেই প্রকৃতির পরিবেশ ব্যাপকহারে পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষ আগুন জ্বেলে গাছের ডালপালা পুড়িয়েছে। বিভিন্ন প্রাণী পুড়িয়ে খেয়েছে। তাতে কৃত্রিম তাপের সাহায্যে কার্বনডাই-অক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা ছড়িয়ে পড়েছিল ক্রমশঃ। বর্তমান জগতে শুধু গাছের ডালপালা কেটে কাঠ পোড়ান হয় না, পোড়ান হয় লক্ষ লক্ষ টন কয়লা ও অপরিশোধিত তেল। এই পোড়ানোর ফলে কার্বনডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর তিন ভাগের দু'ভাগ জল। তাই এই জল কলুষিত হলে মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে তা যথেষ্ট ক্ষতিকর হয়। বিভিন্ন কলকারখানা থেকে যেসব দূষিত পদার্থ বেরোয়, তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধাতু এবং তাদের যৌগ থাকে। নদী বা সমুদ্রের জলে যেসব নোংরা তেল মেশে, সেই তেল জলকে দূষিত করে দেয়। এই তেলকে বিশুদ্ধ করা যায় এক ধরনের কৃত্রিম ব্যাকটিরিয়া দিয়ে। ল্যাবরেটরীতে এই ধরনের ব্যাকটিরিয়াগুলোকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে বহুগুণে বাড়ানো যায়। এবং তাতে ব্যাকটিরিয়ার দেয়াল সৃষ্টি হয়। এই ব্যাকটিরিয়ার দেয়াল দূষিত তেলকে শোধন করে দেয়। এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আনন্দমোহন চক্রবর্তী।

আমাদের কলকাতার মত শহরকে গ্রাস করে আছে কয়েক টন ধূলো, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেনের বিভিন্ন অক্সাইড। এরা শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। নদী বা সমুদ্রে যেসব আবর্জনা এসে মেশে তাদের মধ্যে তামা, সীসা, কোবাল্ট, পারদ প্রভৃতি ধাতু থাকে। এগুলি নদী বা সমুদ্রের প্রাণীর পক্ষে ক্ষতিকর।

নদী বা সমুদ্রের মাছ বা অন্য প্রাণী যখন আমরা খাই, সেগুলি থেকে আমাদের শরীরে বিষ ঢোকে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে বায়ুতে তেজষ্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। সেগুলি বিভিন্নভাবে জলে ও মাটিতে মেশে এবং ফসলের ওপর তার প্রভাব দেখা যায় এবং শরীরে তা প্রবেশ করে। এছাড়া কৃত্রিম রাসায়নিক কীটনাশক পরিবেশকে কলুষিত করছে। জমির ফসল বাঁচাতে এসব কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। এই কীটনাশক জলে ধুয়ে পুকুর, খাল, নদ-নদীতে জমা হয় এবং সেই জল আমরা পান করি। যেসব কীটনাশক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে আছে ডি. ডি. টি., গ্যামাক্সিন, মালাথিয়ন, পারাথিয়ন প্রভৃতি। সম্প্রতি কিছু কিছু কীটনাশক ব্যবহার করার দিকে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হচ্ছে। বর্তমানে ডি. ডি. টি., পি. বি. সি. প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থগুলি ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। গ্রামে অনেকে পুকুর পাড়ে কাপড় কাচে, সেই জলে স্নান করে, গরু ও মোষ স্নান করায়। এর জন্য তারা ডিটারজেন্ট পাউডার, সাবান প্রভৃতি ব্যবহার করে। জামাকাপড় ও শরীরের ময়লা এবং ডিটারজেন্ট জলে মিশে যাচ্ছে। সেই জল আবার অনেকে পানের জন্য ব্যবহার করে থাকে।

পরিবেশকে মানুষ স্বেচ্ছায় দূষিত না করে সেদিকে নজর দিতে হবে। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে সামাজিক চেতনা গড়ে তুলতে হবে। কোন মানুষকে বড় করতে সামাজিক পরিবেশের যেমন প্রয়োজন, তেমনি সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে সুন্দর জীবাণুমুক্ত, ধূলিমুক্ত পরিবেশেরও প্রয়োজন।

তামাক ও ধূমপান

ভারতের এক বিরাটসংখ্যক লোক দারিদ্র্যের সঙ্গে আপোষ করে বসে আছে। তাদের করার তেমন কিছুই নেই। কারণ, এদেশে উপযুক্ত কাজ নেই। অনেক লোককে তাই ছোট ছোট কুটির শিল্পে নিয়োজিত থাকতে হচ্ছে পেট চালানোর দায়ে। ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য কুটিরশিল্প হচ্ছে বিড়ি উৎপাদন। আমরা জানি ধূমপান



স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এ'কথাটি সিগারেটের ক্ষেত্রেই বেশী প্রযোজ্য। আজকাল বিড়ির দিকে অনেক মানুষের ঝোঁক। এটি একটি নেশা। নেশা না মিটলে অনেকে কোন কাজই করতে পারে না। বিড়ির দাম কম, তাই গরীব মানুষ এটিকে সিগারেটের বদলে নেশা হিসেবে নিয়েছে। বর্তমানে বিড়ির রকমফের হয়েছে। তাই সুগন্ধি ও

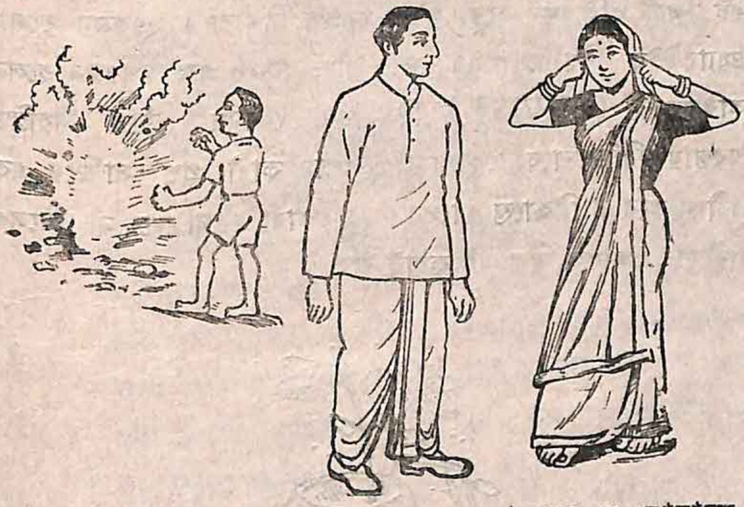
উত্তেজনায় কাঁপতে দেখা যায়। ধূমপানে যে ফুসফুসেরই ক্ষতি হয়, তা নয়, সেই সঙ্গে গলারও ক্ষতি হয়। এতে গলা ভাঙ্গতে পারে, স্বর কর্কশ হতে পারে। অর্থাৎ যাঁরা গান করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে স্বরযন্ত্রের ক্ষতি হওয়াটা বেশীরকম অসুবিধাজনক। তামাকের নিকোটিন একটি বিষাক্ত পদার্থ এবং এটিকে মরফিন, আফিং-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। অত্যধিক মাত্রায় এগুলি গ্রহণ করলে মৃত্যুও ঘটতে পারে। আমেরিকায় এক সমীক্ষা করা হয়েছিল 'বয়-স্কাউট'দের নিয়ে এবং তাতে দেখা যায় যে নিকোটিন গ্রহণে হৃদপিণ্ডের উপর একটা চাপের সৃষ্টি হয় এবং তাতে শরীর অসুস্থ হয়। একটি দণ্ডের উপর দিয়ে কয়েকবার লাফানোর একটি পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাতে দেখা গেছিল যে যারা ধূমপান করেছিল তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই হৃদপিণ্ড বেশ দ্রুতহারে চলেছিল এবং তা স্বাভাবিক হতে সময়ও বেশি নিয়েছিল। কিন্তু যারা ধূমপান করেনি তাদের ক্ষেত্রে হৃদপিণ্ড খুব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং নিকোটিনের ক্ষতিকর দিকটা মনে রেখেই ধূমপান করার কথা ভাবতে হবে।

অনেকে বলেন—তামাক, বিড়ি, সিগারেট প্রভৃতি ক্যানসারের সহায়ক। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যাঁরা কোন রকম ধূমপান বা তামাক সেবন করেন না, তাঁদের মধ্যে গলার ক্যানসার, হৃদরোগের প্রকোপ কম। বিজ্ঞানীরা কোন কোন তামাকের মধ্যে পোলোনিয়াম (Po) এবং অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ অল্প পরিমাণে পেয়েছেন এবং সেগুলি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। গর্ভবতী মায়েরা ধূমপান করলে দেখা গেছে তাদের শিশুদের ওজন তুলনামূলকভাবে কম হয় এবং পূর্ণ সময়ের পূর্বেই সন্তানের জন্ম হয়।

যদিও তামাক জাতীয় জিনিসের উপর বহুলোকের জীবিকা নির্ভরশীল, তবুও এর ক্ষতিকর দিকটা আমরা ভুলে থাকতে পারি না।

মহিলারা কোলাহলে বেশী সচেতন

শান্তিপ্রিয় লোক কি কখনও কোলাহল পছন্দ করে? মোটেই না। বরং সে কোলাহল থেকে দূরে পালিয়ে যেতে চায়। লোকসংখ্যা আর যান্ত্রিক সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোলাহলও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই একে এড়াতে হলে নির্জন কোন স্থানে চলে যাওয়াই ভাল। আর পুরুষমানুষের থেকে স্ত্রীলোকের কাছে এই



কোলাহলটা আরও তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে। দেখা গেছে যে কোলাহল-সচেতন এবং কোলাহল-অসচেতন ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য আছে তার পরিমাণ ১০ ডেসিবেলের উপর। এর দ্বারা তীব্রতার চারগুণের

প্রভেদ বা দ্বিগুণ আওয়াজকে বোঝায়। মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাদের কোলাহল-সচেতনতা অনেকটা বেশি। তাই তাঁরা পুরুষদের চেয়ে ১৩ ডি. বি. কমেই অস্বস্তিবোধ করেন।

সুরবর্জিত শব্দকে আমরা কোলাহল বলে থাকি। সাধারণত শব্দ সৃষ্টিকারী কোন কম্পনশীল বস্তুর কম্পনসংখ্যা একটা নির্দিষ্ট মানের মধ্যে থাকলে আমরা তা শুনতে পাই। বায়ু মাধ্যমে আমাদের কানে সব রকমের কম্পাঙ্ক শব্দের অনুভূতি জাগায় না। দেখা গেছে যে, ২০ থেকে ২০০০০ হার্জ তরঙ্গ পর্যন্ত স্বর শোনা যায়। উৎসের কম্পন যদি অনিয়মিত হয়, তবে তার শব্দ কানের কাছে পীড়াদায়ক হয়। মহিলারা যে পুরুষদের চেয়ে কোলাহলে বেশি সচেতন, এই ব্যাপারটি জানা গেছে এক বিশেষ অধিবেশন থেকে।

১৯৮০ সালের শেষাশেষি ব্রিটিশ মনস্তাত্ত্বিক সংস্থার যে অধিবেশন লণ্ডনে হয়েছিল, সেখান থেকে এই অভিনব ব্যাপারটি জানা যায়। এই তথ্যটি পরিবেশন করেন দু'জন মনস্তত্ত্ব বিশারদ। একজন হলেন ওয়্যারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের জে. আর. টমাস এবং অপরজন হলেন কারডিফের (UWIST) ডি. এম. জোনস। তাঁরা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় বিভিন্নভাবে 'কোলাহল উৎপাদনকারী প্রশ্ন' সাজিয়ে এক পরীক্ষা করে ঐ সিদ্ধান্তে আসেন। মহিলারা একথা মেনে না নিলেও পরীক্ষার ফলাফল কিন্তু এই কথাই বলে।



অন্ধত্ব ও চক্ষু ব্যাঙ্ক

প্রকৃতির সৌন্দর্য আমরা নানাভাবে উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু দৃষ্টিহীনরা ঠিক তেমনভাবে সেটা অনুভব করতে পারে না। দৃষ্টিহীনদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করার পর তাদের মানসিক গঠনের উন্নতি হয়েছে। তারাও বাঁচার মর্ম বোঝে। তারা ব্রেইল বর্ণমালা ব্যবহার করে পুস্তকের পাঠ নিতে পারে। কোন স্থানের পরিচয় দৃষ্টিহীনদের দেওয়ার জন্য এক ধরনের মানচিত্র সৃষ্টি করা হয়েছে। সেই মানচিত্রে ব্রেইল পদ্ধতি অনুযায়ী পথঘাট, নদী, বাড়ি, সেতু প্রভৃতি দেখানোর ব্যবস্থা আছে। এই ধরনের মানচিত্র গঠনের কাজে প্রথম চেষ্টা করেন ওয়াশিংটনের একদল গবেষক। এই পদ্ধতি সফল হলে 'অন্ধজনে দেহ আলো' এই কথার সত্যিকারের প্রতিফলন হবে।

আর এক ধরনের অন্ধতা হচ্ছে বরফের অন্ধতা। ইংরাজীতে বলে 'স্নো-ব্লাইণ্ডনেস'। এটি এক অস্থায়ী অন্ধত্ব। এর ফলে মানুষ সাময়িকভাবে তার দেখার ক্ষমতা হারায়। বরফের উপর প্রতিফলিত হয়ে অতিবেগুনি রশ্মি যদি চোখে পড়ে তবে 'স্নো-ব্লাইণ্ডনেস' হয়। অতিবেগুনি রশ্মি চক্ষু-গোলকের বাইরের কলাকে দগ্ধ করতে পারে। এই অন্ধতা বেশীদিন থাকে না। কালোরঙের চশমা ব্যবহার করে এই অন্ধতা দূর করা যায়।

দৃষ্টিহীনদের জ্ঞানের আলো বিতরণ করা সত্যিই সুখের ব্যাপার, কিন্তু যদি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া যায়, তবেই তো তারা আরো বেশী লাভবান হবে। এজন্য একজনের কর্ণিয়া অন্যকে দান করার

প্রয়োজন। বর্তমানে লক্ষ লক্ষ দৃষ্টিহীন মানুষকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি হবার জন্য। তবে এ ব্যাপারে অসুবিধে দেখা দিচ্ছে চোখের কর্ণিয়া সংগ্রহ করা নিয়ে। মানুষ বিভিন্ন কারণে মৃত্যুর পরেও তার চোখ অপরকে দান করার অঙ্গীকার করতে পারছে না। এর ফলে প্রয়োজনীয় কর্ণিয়া সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। মানুষের কল্যাণমুখী মনকে জাগ্রত করতে পারলে, মানুষ মৃত্যুর পরে তার চোখকে ব্যবহারের অনুমতি দিতে বাধা দেবে না। এই চোখ সংগ্রহের জন্য চক্ষু ব্যাংক গঠন করা হয়েছে। এই ব্যাংক সুস্থ কর্ণিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগ্রহ করে এবং তা প্রয়োজনীয় লোককে সরবরাহ করে। কর্ণিয়ার অস্ত্রোপচার এবং তা অন্যের চোখে ঠিকভাবে স্থাপন করা বর্তমানে সাফল্যের সঙ্গেই সম্ভব হচ্ছে। কর্ণিয়ার রক্তনালী খুব কম থাকায় অন্যের দেহের টিস্যুর সঙ্গে তা সহজেই মিল খায়। একাজ করার জন্য অবশ্যই উপযুক্ত শল্য চিকিৎসক প্রয়োজন। নইলে এত মূল্যবান কর্ণিয়া নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

অন্ধদের মধ্যে যাদের বয়স ১৮ থেকে ৪০-এর মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে নতুন কর্ণিয়া সংযোজন করে বেশী রকম সুফল পাওয়া গেছে। কর্ণিয়া সংগ্রহের জন্য সদ্যমৃত ব্যক্তির কর্ণিয়া অভিজ্ঞ শল্য চিকিৎসক তুলে আনেন এবং তা ঠিকভাবে সংরক্ষিত করেন। সাধারণত এই তুলে আনা কাজটা কোন ব্যক্তির মৃত্যুর ২-৩ ঘন্টার মধ্যেই করতে হয়, নইলে তা আর কার্যকরী হয় না। তুলে আনা চোখকে দীর্ঘদিন কার্যকরী রাখতে গেলে বিশেষ পদ্ধতিতে তা সংরক্ষণ করতে হয়। কর্ণিয়া হল চোখের সামনের স্বচ্ছ অংশ। চক্ষু ব্যাংকের রেফ্রিজারেটরে চোখ রাখা হয় খুব যত্নে।

চক্ষুব্যাংক দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং এই জনপ্রিয়তার জন্য একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান মূলতঃ, কৃতিত্ব দাবী করতে পারে। প্রতিষ্ঠানটির নাম 'ইনটারন্যাশনাল আই ফাউণ্ডেশন', সংক্ষেপে আই.

ই. এফ.। এই প্রতিষ্ঠান ১৯৬১ সালে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওয়াশিংটন ডিসিতে। এবং তখন তার নাম ছিল ইন্টারন্যাশনাল আই ব্যাংক। এই ব্যাংক অন্ধ এবং প্রায় অন্ধ মানুষের বন্ধুস্বরূপ। এই প্রতিষ্ঠান অন্ধত্ব দূরীকরণে গবেষণা আর প্রশিক্ষণের কাজে সাহায্য করে। বিদেশে চক্ষু ব্যাংক খোলার ব্যাপারেও এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বপ্রকার সাহায্য করে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে চক্ষু-বিশেষজ্ঞগণ এই ব্যাংকে এসে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দেশে ফিরে যান।

যদিও এই চক্ষু ব্যাংক ১৯৬১ সালে স্থাপিত হয়, তবুও একজনের থেকে অন্যজনে কর্ণিয়ার স্থাপন ঘটেছিল অনেক আগে ১৯৪০ সালে। প্রথম দিকে একাজ ঠিকমত করা যেত না এবং অনেক কর্ণিয়াই নষ্ট হয়ে যেত; কিন্তু আই. ই. এফের প্রতিষ্ঠাতা এবং মেডিকাল ডিরেক্টর ডাঃ জন এইচ কিং কর্ণিয়াকে জলমুক্ত করে ঘরের উষ্ণতায় তা সংরক্ষণের এক বিশেষ উপায় আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের ফলে একটি চক্ষুকে সহজেই পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য দেশে এনেও কাজে লাগান সম্ভব হয়েছে। তবে এই কাজে সফল হতে হলে শুধু 'আই. এস. এফ.' থেকে চোখ পাঠালেই হবে না, যে দেশে সেটি যাবে, সেখানে উপযুক্ত চিকিৎসাবিদ ও যন্ত্রপাতি থাকা প্রয়োজন।

ভারতে এখন চক্ষু ব্যাংকের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে গিয়ে ৩৪টিতে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যাংকগুলির কাজকর্ম দেখাশোনা করা এবং তার প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে নতুন দিল্লীর 'ন্যাশনাল আই ব্যাংক' যথেষ্ট সাহায্য করছে। এই ব্যাংকের বিশেষজ্ঞরা জনসাধারণের কাছে চক্ষু ব্যাংকের কাজ তুলে ধরেন এবং মৃত্যুর পর তাদের চক্ষু দানে উৎসাহ দেন। চোখ খারাপ হলে সংগে সংগে চক্ষু বিশেষজ্ঞদের কাছে যাওয়ার জন্য তাঁরা পরামর্শ দেন।

সারা ভারতে অন্ধের সংখ্যা ৬০ লক্ষেরও বেশী। তবে একেবারে অন্ধ নয়, অথচ প্রায় অন্ধ এমন লোকের সংখ্যা ভারতে আনুমানিক

তিন কোটি। পশ্চিমবংগে অন্ধের সংখ্যা ছ'লক্ষের উপর। এদের মধ্যে যারা বসন্ত, অপুষ্টি, আঘাত, অপথ্যালমিয়া প্রভৃতির জন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে, তাদেরকে কর্ণিয়া গ্রাফটিং-এর সাহায্যে অন্ধত্ব থেকে বাঁচানো যেতে পারে। কলকাতার নীলরতন সরকার এবং মেডিকাল কলেজে দুটি চক্ষু ব্যাংক আছে। সম্প্রতি ন্যাশনাল মেডিকাল কলেজে আই. ই. এফের সহযোগিতায় আর একটি চক্ষুব্যাংক খোলা হয়েছে।

ভারতে এবং পৃথিবীর অনুন্নত দেশে দেখা যায়; অন্ধত্বের মূলে আছে ছানি, অপুষ্টি এবং বসন্তরোগের আক্রমণ। অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব দেখা যায় শিশুদের মধ্যে বেশী। চোখের দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখতে গেলে ভিটামিন-এ যুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। সম্প্রতি জানা যায় যে, একধরনের টমাটো আছে যাতে ভিটামিন-এ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং এই ধরনের টমাটো গ্রহণ করতে পারলে 'ভিটামিন-এ'-এর অভাব দূর হবে এবং তাতে চোখের দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকবে। বাঙ্গালোরের 'ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটুট অফ সায়েন্স'-এর কয়েকজন বিজ্ঞানী এই টমাটো আবিষ্কার করেন।

১৯৮১ সালের এক সমীক্ষায় জানা যায় যে অপুষ্টির জন্য ভারতের ৬০ হাজার ছেলেমেয়ে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেই অন্ধত্ব ঠেকাতে 'রয়াল কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর ব্লাইণ্ড' সজনে পাতা খাবার পরামর্শ দিয়েছেন। ঐ সংস্থার অধিকর্তা জন উইলসন বলেছেন যে, 'ভিটামিন-এ'-এর অভাবজনিত অন্ধত্ব দূর করার জন্য প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। সজনে পাতা হচ্ছে 'ভিটামিন-এ' পূর্ণ খাদ্য। এই পাতা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই পাতা ছাড়া গাজরেও ভিটামিন-এ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

অনেকের চোখ আবার ট্যারা দেখা যায়। এটি একটি গুরুতর রোগ বলা যেতে পারে। ট্যারা হবার প্রধান কারণ হচ্ছে, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গোলোযোগ এবং তাতে চক্ষু সঞ্চালনের নিয়ন্ত্রণকারী

মাংসপেশী পরিচালনায় বাধা পায়। এর ফলে দুই চোখ দিয়ে দেখার কাজে বাধার সৃষ্টি হয়। ভারতে মোট শিশুর প্রায় দুই শতাংশ ট্যারা। চোখে দেখার মূলে আছে বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনায় অবস্থিত ফোবিয়ায় পড়া। কিন্তু ট্যারা চোখের ক্ষেত্রে বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনার ফোবিয়াতে পড়ে না। সেটি পড়ে রেটিনার কোন এক পাশের জায়গায় এবং তখন দেখার বস্তু দুটি হয় এবং মস্তিষ্কের সাহায্যে এই অবস্থার অবসান ঘটে এবং তাতে চোখ ট্যারা মনে হয়। এই ট্যারা ব্যাপারটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় যদি সময়মত চশমা নেওয়া যায়। বেশী বয়স হয়ে গেলে শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয়। ট্যারা চোখের যে চিকিৎসা করা হয় তার একটি বিশেষ পদ্ধতির নাম অর্থো-অপটিকস্।

সুতরাং চোখ খারাপ হলে বা অন্ধ হলে আমাদের নিজেদের সজাগ হতে হবে। চক্ষু বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে নিকটবর্তী চক্ষুব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অন্ধত্ব যা আমাদের সমাজের এক বিরাট অভিশাপ তাকে মোকাবিলা করার জন্য সমগ্র মানবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। চক্ষুব্যাংকের বিশেষজ্ঞদের ডঃ জন. এইচ. কিং-এর আদর্শ মেনে সমাজের কাছে নিজেদের নিযুক্ত রাখতে হবে। সব প্রচেষ্টা সার্থক হলে ক্রমে ক্রমে এই অন্ধত্বের শিকার থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এক নতুন আলোর সন্ধান পাবে।

—



প্রাত্যহিক জীবনে সাবান



আমাদের শরীরের রঙ যদি কালো হয়, তবে তা কিন্তু সহজে বদলানো যাবে না। ময়লা লেগে যদি মুখ বা শরীরের অন্যান্য অংশ কালো বলে মনে হয় তবে কিন্তু তা দূর করার সহজ ব্যবস্থা আছে। শুধু আমাদের শরীর কেন, আমরা যে জামা-কাপড় ব্যবহার করি তার উপর জমা ময়লাকে দূর করতে পারে এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য। এই রাসায়নিক দ্রব্যটির নাম হলো সাবান। সাবানের সঙ্গে বর্তমানে প্রায় সব মানুষই পরিচিত।

সাবান বিভিন্ন ধরনের হয়। কোনটি গায়ে মাখার, কোনটি দাড়ি কামাবার, আবার কোনটি কাপড় কাচার। বিভিন্ন ধরনের কাপড় কাচার জন্য আবার বিভিন্ন ধরনের সাবান ব্যবহার করা হয়। শিল্পে ভারী ধাতুর সাবান ব্যবহার করা হয়। ভারী ধাতুর সাবানের মধ্যে আছে বেরিয়াম, সীসা, ম্যাঙ্গানীজ, লোহা এবং ষ্ট্রনসিয়াম সাবান। এসব সাবান অবশ্য গায়ে মাখা বা কাপড় কাচার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় না। এগুলি রঞ্জন শিল্প, জলনিরোধক শিল্প প্রভৃতিতে ব্যবহার করা হয়। গায়ে মাখা সাবানের মধ্যে আছে শিশুদের উপযোগী বেবী সোপ, খর জলে ব্যবহারযোগ্য সাবান, আয়োডিন সাবান, পার-অক্সাইড সাবান, গ্লিসারিণ সাবান এবং ফরম্যালডিহাইড সাবান। এছাড়া আরও নানা-ধরনের সাবান আছে। যেমন – ভিটামিন সাবান, গরম জামাকাপড় কাচার সাবান, ট্যানারী সাবান, অটোমোবাইল সাবান প্রভৃতি। চামড়া

পরিষ্কার করতে ট্যানারী সাবান এবং বিভিন্ন গাড়িতে ব্যবহারের জন্য অটোমোবাইল সাবান ব্যবহার করা হয়।

সাবান জিনিসটা কি তা এবার জানা যাক। এটি এক ধরনের লবণ এবং তা তৈরী হয় এক ধরনের জৈব ফ্যাটি অ্যাসিড (যা চর্বি বা ফ্যাট ও তেলে পাওয়া যায়) এবং সোডিয়াম বা পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বিক্রিয়া দ্বারা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, ট্রাই পামিটিনকে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষ ঘটিয়ে সাবান (সোডিয়াম পামিটেট) পাওয়া যায় এবং সেইসঙ্গে উপজাত হিসেবে পাওয়া যায় গ্লিসারিন। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করে যে সব সাবান তৈরী করা হয় সেগুলি একটু শক্ত ধরনের হয় কিন্তু পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করলে উৎপন্ন সাবান নরম হয় এবং তা জলে বেশী দ্রবণীয়। এগুলি প্রধানত দাড়ি কামানো বার সাবান, ক্রীম এবং শাম্পু তৈরী করতে ব্যবহার করা হয়। প্রসাধনী সাবান তৈরীতে ভারতে নারকেল তেলই প্রধানত ব্যবহার করা হয়, কারণ দক্ষিণ ভারতে এই তেলের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে হয়।

সাবান তৈরীতে যে সব তেল ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে তিলের তেল, তালের তেল, নারকেল তেল, বাদাম তেল, তিসির তেল প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ তেল উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় প্রাণিজ তেলও ব্যবহার করা হয় এবং এর জন্য প্রধানত শুশুকের তেল, গরু-মোষ, তিমি ও অন্যান্য মাছের তেল ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে এইসব তেল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সাবান তৈরী করা হচ্ছে বেশী করে, কারণ নারকেল, তিল বা তিসির তেল ভোজ্য পদার্থ হিসেবেই প্রধানত ব্যবহার করা হয়। নিম তেল, তামাক বীজের তেল প্রভৃতির তেল থেকেও আজকাল সাবান তৈরী হচ্ছে, কারণ এইসব তেল যথেষ্ট পরিমাণে আমাদের দেশে পাওয়া যায়। এইসব তেলের সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে ক্ষার মিশিয়ে গরম করা হয় এবং তার মধ্যে সাধারণ লবণ মেশালে সাবান পাওয়া যায় এবং

দ্রবণে গ্লিসারিণ উপজাত দ্রব্য (byproduct) হিসেবে পাওয়া যায়। এই সাবান উপযুক্ত পরিমাণ জলে ধুয়ে ক্ষারমুক্ত করা হয় এবং আবার গরম করে বিশুদ্ধ সাবান পাওয়া যায়। বিভিন্ন ছাঁচে ফেলে সাবানকে বিভিন্ন আকারে প্রস্তুত করা হয়। গায়ে মাখা ও কাপড়কাচা সাবান তৈরীর পদ্ধতি একই প্রকার। সাবান প্রস্তুত করার সময় বিভিন্ন রং ও সুগন্ধি মিশিয়ে বিভিন্ন ধরনের সাবান তৈরী করা হয়। ক্ষার হিসাবে সাধারণত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করা হয়। কলিচূণ একটি ক্ষার, এটির সাহায্যেও সাবান প্রস্তুত করা যায় এবং এর দ্বারা উৎপন্ন সাবানকে ক্যালসিয়াম সাবান বলে। সোডিয়াম, পটাসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম প্রভৃতির হাইড্রোক্সাইডগুলিকে অজৈব ক্ষার বলে। জৈব ক্ষার দিয়েও সাবান তৈরী করা যায়। জৈব ক্ষারের মধ্যে সাধারণত ট্রাই ইথাইল অ্যামিন ব্যবহার করা হয় এবং এর ব্যবহার হয় স্নো, ক্রীম প্রভৃতি তৈরীর জন্য।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত গরম ও ঠাণ্ডা এই দুই পদ্ধতিতে সাবান প্রস্তুত করা হত। বর্তমানে গরম পদ্ধতি প্রায় বাতিল হয়ে যাচ্ছে, কারণ আধুনিক ধারাবাহিক পদ্ধতি (modern continuous process) এখন অবলম্বন করা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে চর্বিকে আর্দ্র বিশ্লেষণ করা হয় একটি নির্দিষ্ট চাপ, উষ্ণতা এবং অনুঘটকের উপস্থিতিতে। অনুঘটক হিসেবে চূণ বা জিংক-অক্সাইড ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে যে ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন হয় তাকে একটি প্রকোষ্ঠে পাম্প করে আনা হয়। প্রকোষ্ঠটিকে প্রশমন প্রকোষ্ঠ বলা হয়, কারণ এখানে এই অ্যাসিড কষ্টিকসোডা বা সোডা অ্যাশের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে সাবান প্রস্তুত করে।

ময়লা দূর করতে সাবান কিভাবে কাজ করে তা এবার জানা যাক। যে ময়লা কাপড় বা শরীরে আসে সেগুলি জমা হয় এক ধরনের চটচটে পদার্থের সাহায্য নিয়ে। যখন সাবান দিয়ে ঘষা হয়,

তখন এই চটচটে পদার্থটি ধুয়ে বেরিয়ে যায় এবং এই কাজ দু'ভাবে হয়। (১) এটি গ্রীজের সঙ্গে ইমালসন গঠন করে এবং তাতে ময়লা-গুলি গ্রীজ থেকে আলগা হয়ে যায় এবং (২) সাবান জলের সঙ্গে একটি কোলয়েড দ্রবণ সৃষ্টি করে এবং ময়লা এই দ্রবণের কণার উপর-ভাগে শোষিত হয়।

সাধারণভাবে ভাল সাবান বলতে আমরা বুঝি সেই সাবান যে সাবান জলে বেশী পরিমাণ ফেনা তৈরী করতে পারে। এই ফেনা কাপড় বা শরীরের ময়লা দূর করে। ফেনা হওয়াটা অবশ্য নির্ভর করে সাবান এবং জল দুয়েরই উপর। যে জলে সাবান সহজে ফেনা তৈরী করে, সে জলকে মৃদুজল বলে, আর সেই সাবান দিয়েই যদি কোন জলে সহজে ফেনা না হয়, তবে সেই জলকে খর-জল বলে। খর-জলকে অবশ্য মৃদুজলে পরিণত করার অনেক উপায় আছে। জলের খরতার কারণ হিসেবে বলা যায় যে জলে সাধারণত ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের বাই-কার্বনেট, ক্লোরাইড ও সালফেট দ্রবীভূত থাকে। লবণাক্ত জলে সাবান সহজে ফেনা সৃষ্টি করতে পারে না। তাই সাধারণ সাবান দিয়ে সমুদ্রের জলে কাপড় কাচা সম্ভব হয় না। সমুদ্রের জল এবং অন্য-খর জলে ব্যবহারের উপযুক্ত সাবানও বর্তমানে প্রস্তুত করা হয়েছে। আম্লিক দ্রবণেও সাবানের অপচয় ঘটে। কোন আম্লিক দ্রবণে সাবান দিয়ে ঘষলে সেই দ্রবণটি ছানা কাটার মতো অবস্থা হয়। সুতরাং খর-জল ও লবণাক্ত জলে সাধারণ মানের সাবান ব্যবহার করা যায় না। বর্তমানে কাপড় কাচার জন্য সাবানের পরিবর্তে নানা ধরনের ডিটারজেন্ট পাউডার ব্যবহার করা হয়।

বাদাম বা তিসির তেলের থেকে যে সাবান পাওয়া যায়, তা হয় খুব নরম এবং তার ফেনাও হয় কম। কিন্তু যদি বাদাম বা তিসির তেলের বদলে নারকেল তেল ব্যবহার করা যায় তবে সাবানের ফেনা ভাল হয়। বাদাম বা তিসির তেলের সঙ্গে আরও বিভিন্ন

তেল মিশিয়ে সাবান তৈরী করলে সে সাবান অপেক্ষাকৃত শক্ত হয় এবং বেশী ফেনা সৃষ্টি করতে পারে। কাপড়কাচা সাবানে কাপড়কাচা সোডা, খড়িগুঁড়া, সোডিয়াম সিলিকেট প্রভৃতি জিনিস মিশিয়ে অনেকে সাবানের মান নিচু করেন ও এগুলিকে সাবানের ভেজাল বলা হয়। অতিরিক্ত মাত্রায় সিলিকেট মেশান থাকলে সে-সব সাবান দিয়ে গরম জামা কাপড় কাচা যায় না। এইপ্রকার সাবান রেশম-পশমের বস্ত্রে ব্যবহার করলে সেইসব বস্ত্র মোটেই পরিষ্কার হয় না এবং বস্ত্রে নানারকম দাগের সৃষ্টি হয়। গরম জামা কাপড় কাচার জন্য উৎকৃষ্ট মানের সাবান ব্যবহার করা হয় এবং সেই সাবান সত্যিকারের প্রশম হতে হবে, নইলে বস্ত্রের ক্ষতি হয়। এবং সেইসব সাবান সাধারণত জৈব ক্ষারের সাহায্যে তৈরী করা হয়। সোডিয়াম বা পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ব্যবহার করে এই ধরনের সাবান প্রস্তুত করা যায় না। শিশুদের জন্য যে বেবী সোপ তৈরী করা হয়, তাতে মোম বা চর্বিজাতীয় পদার্থ মেশান থাকে। এই চর্বিজাতীয় পদার্থে থাকে ল্যানোলীন যা শিশুর শরীরের কোমল ত্বককে রক্ষা করে। কখনো কখনো বেবী সোপে সালফোনেটেড রেড়ির তেল মেশান হয়। এই তেল সামান্য আম্লিক এবং এটি জলে উৎপন্ন সাবানের ক্ষারকে অনেকটা নষ্ট করে দেয় এবং ফলে সাবানের ক্ষার শরীরে কোন ক্ষতি করতে পারে না।

সমুদ্রের জলে ব্যবহারের উপযুক্ত যে সাবান তৈরী করা হয় তার জন্য নারকেল, তাল বা বাবাসু তেল প্রভৃতি কাজে লাগে। এইসব সাবান তৈরীর সময় তেল এবং ক্ষার উপযুক্ত মাত্রায় মিশিয়ে দিলেই হয় এবং উত্তাপের বিশেষ প্রয়োজন হয় না এবং সেজন্য এইভাবে প্রস্তুত সাবানের পদ্ধতিকে 'শীতল প্রক্রিয়া' বলা হয়। দাড়ি কামানোর সাবান তৈরী করতে কয়েকটি জিনিস যোগাড় করতে হয়। বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অনুপাতে এটি তৈরী করা যায়। সাধারণভাবে নারকেল তেল,

ক্যাষ্টর তেল, চর্বি, ষ্টিয়ারিক অ্যাসিড এবং কষ্টিক পটাশ ব্যবহার করেই এটি তৈরী করা হয় এবং সাবানটি গন্ধযুক্ত করার জন্য সিট্রোনিলা তেল, লেভেণ্ডার তেল, চন্দনকাঠের তেল, রোজ জিরেনিয়াম প্রভৃতির কয়েক-ফোঁটা মিশিয়ে দেওয়া হয়। গায়ে মাখা সাবানেও এইসব গন্ধদ্রব্য ব্যবহার করা যায়। কাপড়কাচা সাবান তৈরীর জন্য যে সব দ্রব্য ব্যবহার করা হয় সেগুলির মধ্যে আছে নারকেল তেল, চীনাবাদাম তেল (গ্রাউণ্ড নাট তেল), মহুয়া তেল, রোজিন এবং কষ্টিক সোডা। তরল সাবান যা গায়ে মাখা সাবান হিসেবে পাওয়া যায়, সেগুলি তৈরী হয় বাদাম তেল বা তাল তেল, ক্যাষ্টর তেল. লিনসীড তেল, রোজিন, কষ্টিকসোডা এবং জলের সাহায্যে।

চামড়ার জ্বালাযন্ত্রণায় নারকেল, পাম-কারনেল বা বাবাস্থ তেলের সঙ্গে রেড়ির তেল এবং অল্পপরিমাণে রোজিন ব্যবহার করা যেতে পারে। জলপাই তেল থেকে তৈরী সাবানকে বলা হয় ক্যাস্টিল সাবান। এটি খর-জলে ফেনা উৎসাদন করতে পারে না। কিন্তু কোকো ক্যাস্টিল শ্রেণীর সাবান ব্যবহার করলে জলে প্রচুর ফেনা সৃষ্টি হয়। খর-জলে যদি ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট জাতীয় পরিষ্কারক ব্যবহার করা যায়, তবে সুফল পাওয়া যায়। এটি শরীরে কোনরকম প্রদাহ সৃষ্টি করে না। সোডিয়াম ট্রাইফসফেট ব্যবহার করে যে সাবান তৈরী হয় তা বয়ন শিল্পে ব্যবহার করা হয় এবং তাতে কাপড়ে কোন দাগ পড়ে না।

চামড়ার শিল্পে এক বিশেষ ধরনের সাবান ব্যবহার করা হয় এবং সেসব সাবান নরম এবং আঠালো হয়। কষলাগানো চামড়ায় এটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়। শ্রমিকরা কারখানায় কাজ করার পর হাত-পা পরিষ্কারের জন্য যে সব সাবান ব্যবহার করে, সেগুলির মধ্যে মিহি বালি মেশান থাকে এবং কখনো কখনো পিউমিস নামের পাথর জাতীয় পদার্থ মেশান থাকে। এই সাবান নরম ও কঠিন দুই

প্রকারের সম্ভব। আঠালো কষযুক্ত, তেলজাতীয় ময়লা এই জাতীয় সাবান দিয়ে দূর করা যায়।

এইভাবে সাবান ময়লা তাড়ানোর কাজে এসে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখে এবং সেকাজে সাবান তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

—



নানারঙের নানাকথা

আমরা প্রকৃতির যেদিকে তাকাই সেদিকেই নানা রঙের খেলা দেখতে পাই। আকাশে যে রঙবেরঙের মেঘ উড়ে যায় তা ভারি সুন্দর দেখায়। আমরা জানি সাদা আলোকরশ্মি যখন কোন প্রিজমের সাহায্যে বিশ্লিষ্ট হয় তখন সাতটি রঙের সৃষ্টি হয়। এই সাতটি রঙ হল বেগুনি, গাঢ়নীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল। এখন কয়েকটি রঙ আছে যেগুলি আমরা কেউ কেউ পছন্দ করি আবার কেউ কেউ করিও না। কিন্তু এই রঙগুলি সব শুভদিকের ইঙ্গিত দেয়। ধরা যাক লাল রঙ। এই রঙটি আমরা দেখতে পাই আমাদের রক্তে, আর পাই অনেক ফুলে। যেমন জবা, লাল গোলাপ প্রভৃতিতে। এই লাল রঙ আমাদের শরীরের সামর্থ্যকে বোঝায়। এরপর ধরা যাক নীল রঙের কথা। এটি আমরা দেখতে পাই আকাশে এবং এই রঙ মায়া বা মমতার প্রতীক। বেগুনি রঙ দেখতে পাই বেগুন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ প্রভৃতিতে। এই রঙ বলতে চায় বুদ্ধির কথা। নীলরক্তিমা ভাব বা লিলাক রঙ বোঝাতে চায় সজীবতা এবং এই রঙ জলপাইজাতীয় গাছের ফুলে দেখা যায়। গোলাপ ফুলের গোলাপী রঙ বোঝাতে চায় মধুরতা। সবুজ রঙ বোঝাতে চায় আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এবং রঙটি দেখতে পাওয়া যায় নানা গাছের পাতায় পাতায়। বিভিন্ন ফুলে, ফলে বা পদার্থে এইসব রঙ আমরা দেখতে পাই এবং এরা প্রত্যেকেই ভাল (good)-এর দলে। এই দলে আর একটি রঙকে টানা যায়। সেটি হল সাদা। এই রঙ আসলে কয়েকটি

রঙের মিশ্রণ। দুধ, ডিম, সাদা পদ্ম, টগর, জুঁই প্রভৃতির মধ্যে এই রঙ আমরা খুঁজে পাই। এই সাদা রঙ পবিত্রতাকে বোঝায়।

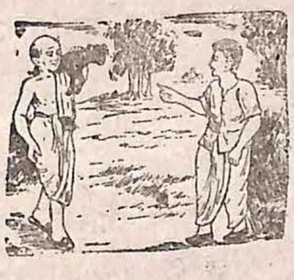
এবার আরও কয়েকটি রঙের কথা বলি যেগুলি কারো কারো কাছে প্রিয়, আবার কারো কারো কাছে অপ্রিয়। বিভিন্ন বস্তুর মধ্যেই তাদের পাওয়া যাবে। যেমন ময়ূরপঙ্খীর রঙ বা বেগুনি-লাল রঙ হচ্ছে দর্প বা অহঙ্কারের, কমলা রঙ বিলাসিতার, এবং হলুদ হচ্ছে মূর্খতার প্রতীক। এই হলুদ রঙ দেখতে পাওয়া যায়—সূর্যমুখী, সরষে ফুল প্রভৃতির মধ্যে। আর সবশেষে যে রঙ পড়ে রইল সেটি হল কালো। এই রঙ দুঃখ, অন্ধকারের প্রতীক। এই কয়েকটিকে আমরা অশুভ বা খারাপের (bad) দলে ফেলে থাকি।

তবে চোখ আর মনের কাছে বিভিন্ন রঙের কদর বিভিন্নভাবে। কোন অস্বচ্ছ বস্তু যে বর্ণের আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করে, আমরা বস্তুটির সেই বর্ণ দেখতে পাই। এই কারণে কোন হলুদ ফুলে সাদা আলো এসে পড়লে ফুলটি হলুদ বর্ণের আলো প্রতিফলিত করে এবং সাদা আলোর অবশিষ্ট আলোগুলিকে শোষণ করে ফেলে। এই কারণেই লাল ফুলকে লাল, নীল ফুলকে নীল দেখা যায়। এখন লাল ফুলের উপর যদি নীল আলো ফেলা যায় তবে লাল ফুল আর লাল দেখা যাবে না। তখন তাকে কালো দেখাবে। এর কারণ হলো লাল ফুল বাইরে থেকে ফেলা নীল আলোকে শোষণ করে নেয় এবং তা কোনো আলোই প্রতিফলিত করে না। আর তাই লাল, নীলের দাপটে কালো বনে যায়। আসলে সাদা আর কালো এই দুটি কোনো বিশেষ রঙ নয়। যখন কোন বস্তু সব আলো শোষণ করে নেয় এবং কোন আলো প্রতিফলিত করে না তখন তাকে কালো দেখায় আর সাতটা রঙের আলো মিলিত হলেই পাওয়া যায় সাদা আলো।

মানুষের মন এই বিভিন্ন বর্ণকে বিভিন্নভাবে সাজিয়ে নিয়েছে। তাই কোনো রঙকে শুভ আবার কোনো রঙকে অশুভ বলে সে ছাপ

মেরে দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবনেও মানুষ রঙকে নানাকাজে লাগায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ রঙের ভূমিকা এখন আমরা মেনে নিয়েছি। লাল আলোর সংকেত যেমন গাড়ি থামার নির্দেশ দেয়, আবার এই লাল রঙই ব্যবহার হয় আগুন নেবানো যন্ত্রে। নীল একটি রঙ যা ঠাণ্ডাভাব প্রকাশ করে এবং সেটি অনেক সময় সতর্ক করার কাজে ব্যবহার হয়। অনেক সময় বাদামী রঙ গরম জিনিসকে বোঝানোর জন্য এবং সবুজ রঙ প্রাথমিক চিকিৎসা বাক্সে ব্যবহার করা হয়।

রঙের এই বৈচিত্র্য শুধু প্রকৃতিকে সাজিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, সেটি আবার মনকে নানারঙে দোলা দিয়ে তার কাজ পূর্ণ করছে।



ধর্ম·বিজ্ঞান ও আমরা

বিজ্ঞান মানুষকে দ্রুতগামী করেছে। একদিকে সে যেমন মেটায় মানুষের মনের অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে তারই অপব্যবহারে পৃথিবীতে নেমে আসে দুঃখ, অশান্তি। এর দৌলতেই তৈরী হয়েছে পরমাণু বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, শক্তিশালী মারণাস্ত্র প্রভৃতি। এদের ব্যবহার মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর আঘাত হানলে তার ফল হয় খুবই বেদনাদায়ক। আবার এইসব মারণাস্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে তা মানবসেবার কাজে আসে। আলফ্রেড নোবেল একথা উপলব্ধি করেই মারণাস্ত্রের ওপর তাঁর মনের জোর খাটাতে পেরেছিলেন। বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষ চাঁদে যেতে পেরেছে আজ। এছাড়া আরও বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সে করেছে। সে সব জায়গায় এখনো পর্য্যন্ত প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এর ফলে ধর্ম্মশাস্ত্রের সেই চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, বিষ্ণুলোক, স্বর্গ, পাতাল আজ অবাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে। মহাকাশের বহু তথ্যই আজও অজানা থাকলেও বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে ধর্মশাস্ত্রের বা পুরাণের অনেক কিছুই যুক্তিগ্রাহ্য নয়, তাই গ্রহণীয়ও নয়। যেমন সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের যে ধারণা আগে ছিল তা আজ মিথ্যে বলে প্রমাণিত। রাহু কেতুর উদ্ভট চিন্তা অনেকের মন থেকেই মুছে গেছে। বাসুকী নাগের মাথায় পৃথিবী, আদম ইভের কাহিনী আজ ভেসে গেছে ডারউইনের ক্রমবিবর্তনবাদের ঢেউয়ে। নানা রকম ভৌতিক গল্প, জাদুবিদ্যার গল্প সেক্সপীয়ারের আমল থেকেই শুনে আসছি। এগুলির আর যা ব্যাখ্যাই থাকনা কেন—বিজ্ঞান এদের আমল দেবে না। যে

সমস্ত ঘটনার পেছনে যুক্তি আছে—তাই বিজ্ঞানভিত্তিক। আমাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যতই বাড়বে, ততই আমরা পুরাতন ভুল ধারণা থেকে মুক্তি পাবো। এক সময় মানুষ আগুনকে দেবতা জ্ঞানে ভয় করতো, পূজা করতো। কিন্তু আগুনই হচ্ছে মানবসভ্যতার প্রথম আবিষ্কার। আজ ভূমিকম্প, বজ্রপাত, ঝড় প্রভৃতি সম্বন্ধে মানুষ আগেভাগেই সতর্ক হতে পারে। যেসব জিনিসের ব্যাখ্যা দিতে পারেনি মানুষ, সেখানে অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করেছে অজ্ঞ মানুষ। এই অলৌকিক শক্তির পেছনে যিনি বা যে শক্তি আছে, তাকেই আমরা ভগবান বা ঈশ্বর বলে মনে করি।

ভগবান বা ঈশ্বর কি, তা নিয়ে অনেক কিছুই আলোচনা সম্ভব। কারণ, বিভিন্ন মনীষী ঈশ্বরকে বিভিন্নভাবে চিন্তা করেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য বিশিষ্ট চিন্তাবিদ স্পিনোজা যা বলেছেন, তা তুলে ধরা যাক। স্পিনোজা বলেছেন, 'অনেকে মনে করেন যে মানুষের মত ঈশ্বরেরও শরীর ও আত্মা আছে। আর তাই তাঁর আছে কাম, ক্রোধ, মোহ, সুখ ও দুঃখ', এবং তিনি আরও বলেছেন যে, 'এইসব লোকেদের ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন সঠিক ধারণা নেই। আদি ও অন্তহীন ঈশ্বরকে নির্দিষ্ট শরীরের মধ্যে আবদ্ধ রেখে চিন্তা করা নিতান্তই অবাস্তব ও অযৌক্তিক।'

স্পিনোজার এই মতবাদকে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন মনে প্রাণে সমর্থন করতেন, এবং তিনি বলতেন, 'স্পিনোজার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর।'

রবীন্দ্রনাথ ধর্মের অধিকার প্রসঙ্গে বলেছেন—'ধর্ম কেবলই মানুষকে বলিতেছে, তুমি অমৃতের পুত্র, ইহাই সত্য, ব্যবহারত মানুষের স্খলন পদে পদে হইতেছে তবু ধর্ম তাহার সত্য পরিচয়কে উচ্চে ধরিয়া রাখিতেছে। ...ধর্মের বিকারেই গ্রীস মরিয়াছে, ধর্মের বিকারেই রোম বিলুপ্ত

হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নাই।'

এবার বাস্তব জীবনের একটা উদাহরণ তুলে ধরা যাক। যখন আমরা রোগাক্রান্ত হই তখনই সাধারণত ওষুধ গ্রহণ করি। কিন্তু আদিমযুগে মানুষ জানত না, রোগ কি করে হয়। তাই তখন তারা কোন এক শক্তির কাছে প্রার্থনা করত রোগ নিরাময়ের জন্য। কিন্তু ধীরে ধীরে সচেতন হয়ে মানুষ বুঝতে শিখলো রোগের উৎসটা কোথায়, কিভাবে তার নিরাময় সম্ভব। এইভাবে মানুষ ওষুধ প্রস্তুত করতে শিখলো আজকের দিনে বহু কঠিন রোগের নিরাময় সম্ভব। একজনের চোখ দিয়ে আর একজনের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া, কিডনির বদল ঘটানো এখন সম্ভব হয়েছে। শুধু মানুষের মধ্যেই নয়, ওষুধের ব্যবহার আজ অন্য প্রাণীদের ক্ষেত্রেও হচ্ছে ব্যাপক হারে।

অজ্ঞতা, অন্ধ বিশ্বাস, সংস্কার আমাদের সুচিন্তার মুখকে বেঁধে দিয়েছে। সত্যকে, বাস্তবকে মেনে নেবার মত মন তৈরী করতে হবে। ধর্মের নামে মানুষকে ঠকানো চলবে না। কারণ আমরা জানি, যে ধর্ম মানুষকে ভালবাসতে শেখায় না, শুভবুদ্ধির উন্মেষ ঘটায় না, তা ধর্ম নয়। ভণ্ডামির নামান্তর মাত্র। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'যে ধর্ম গরীবের দুঃখ দেখে না, মানুষকে দেবতা করে না—তা আবার ধর্ম্ম ?' আমাদের দেশে ধর্মের সঙ্গে জ্যোতিষবিদ্যা একেবারে মিশে গেছে। ধর্মভীরু বহু মানুষই তাই জ্যোতিষবিদ্যায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু জ্যোতিষবিদ্যা কি সত্যিই কোন বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যা ? একথা নিয়ে বাদানুবাদ না করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি তুলে ধরা হল। জ্যোতিষ সম্বন্ধে বিবেকানন্দের মন্তব্য —'জ্যোতিষে বিশ্বাস সাধারণত একটি দুর্বলতার লক্ষণ। এই দুর্বলতা এলেই আমাদের উচিত ডাক্তার দেখিয়ে ভালভাবে খাওয়া আর বিশ্রাম করা।' বুদ্ধদেব বলেছেন—'যাঁরা গ্রহ-নক্ষত্রের হিসাব করে সুখ-দুঃখের নানা ঘটনার পূর্বাভাস দিতে পারেন বলে দাবী করেন—তাঁদের সংশ্রবে

না থাকাই উচিত।' জ্যোতিষ শাস্ত্রের কথা বলতে গিয়ে প্রখ্যাত বিজ্ঞান-লেখক আইজাক অ্যাসিমভ তাঁর 'মারস, দি রেড প্লানেট' বইতে বলেছেন, 'বর্তমানে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে জ্যোতিষ একটি ধাপ্পা, যদিও লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন পর্যন্ত এটিকে গভীরভাবে বিশ্বাস করেন। প্রাচীনকালে জ্যোতিষ মানুষের মনে একটা গভীর দাগ কেটেছিল, এবং এজন্য তাঁদেরকে আমরা দোষ দিতে পারি না। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করে আকাশ নিয়ে অনেক চর্চা করেছিলেন এবং শেখবার চেষ্টা করেছিলেন কি করে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় এবং তাতে লাভ হয়েছে যে বিজ্ঞানের বহু নতুন তথ্য আবিষ্কার হয়ে গেছে।'



শেষ